পাক্ষিক

আহ্‌মদী

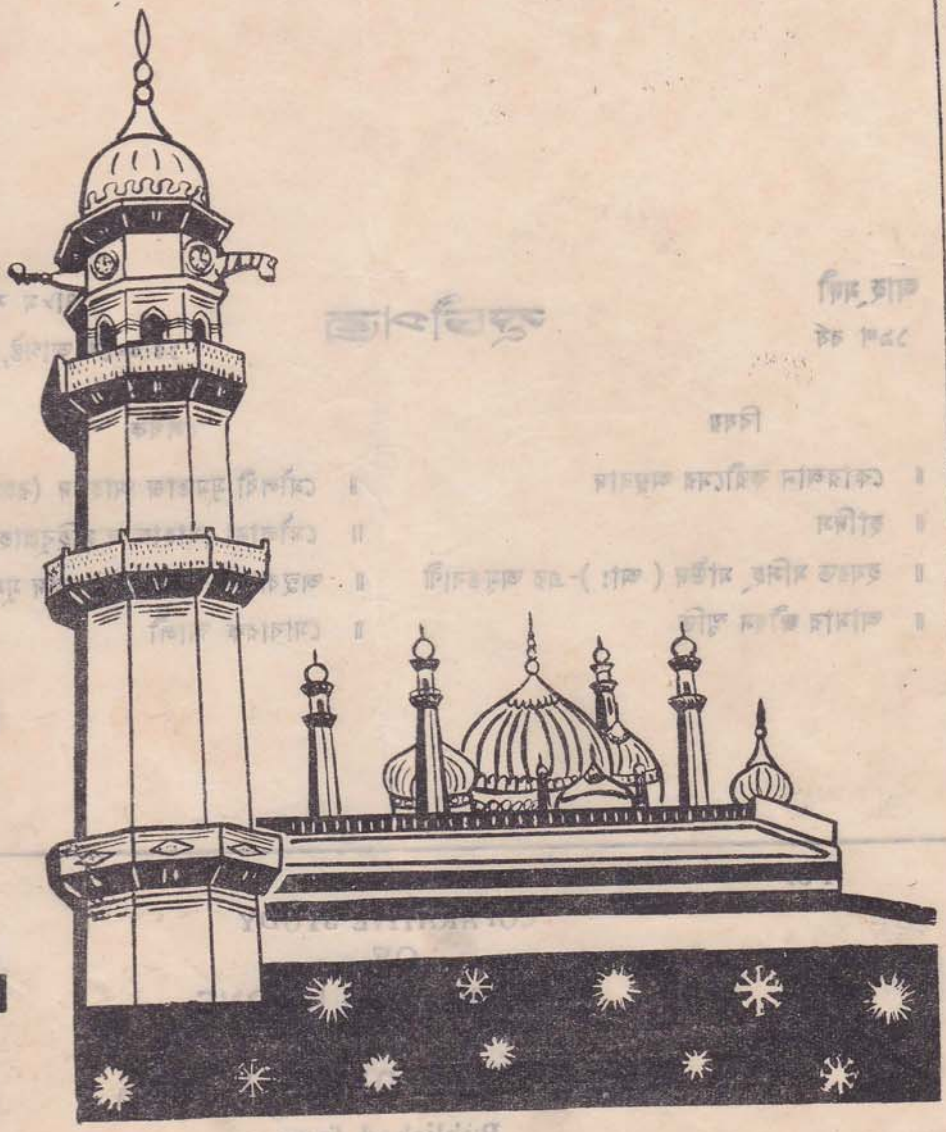

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত— ৫ টাকা

৭।৮ম সংখ্যা
১৫।১০শে আগষ্ট, ১৯৬৫

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

৭।৮ম সংখ্যা
১৫।৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ১২৯
॥ হাদিস	॥ মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্	॥ ১৩১
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা	॥ ১৩৪
॥ আমার জীবন স্মৃতি	॥ মোবারক আলী	॥ ১৩৫

For
COPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫-৩০শে আগষ্ট : ১৯৬৫ সন : ৭।৮ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

৫ম রুকু

৪১। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং উহার সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার সমূহ উদ্‌ঘাটিত করা হইবে না এবং তাহারা বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না উষ্ট্র সূচীর ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করে। এবং এই ভাবেই আমরা পাপীদিগকে প্রতিফল দান করিয়া থাকি।

৪২। এবং তাহাদের জন্য (নীচে) দোযখের (আগুনের) বিছানা থাকিবে এবং উপরে থাকিবে (উহারই)

চাদর। এবং এই ভাবেই আমরা অত্যাচারী-দিগকে প্রতিফল দান করিয়া থাকি।

৪৩। এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপো-যোগী সৎকর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে—আমরা কাহাকেও তাহার যোগ্যতার বাহিরে দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না—উহারাই বেহেস্তের অধিবাসী; তাহারা তথায় সদাকাল বাস করিবে।

৪৪। আমরা তাহাদের হৃদয় হইতে প্রতিহিংসা দূর করিয়া দিব। তাহাদের অধীনে বহু নদী প্রবাহিত হইবে। এবং তাহারা বলিবে সকল (প্রকার) প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি আমাদিগকে ইহারই জন্য সুপথগামী করিয়াছেন। আমরা কখনও সুপথ প্রাপ্ত হইতাম না যদি না তিনি আমাদিগকে সুপথগামী করিতেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর পয়গম্বরগণ সত্য সহকারে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে উচ্চস্বরে বলা হইবে, উহাই সেই বেহেস্ত তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে—তোমাদের কার্যের পুরস্কার স্বরূপ।

৪৫। এবং বেহেস্তের অধিবাসীরা দোযখবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে যে, আমাদের প্রভু যাহা আমাদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই আমরা পাইয়াছি। সুতরাং তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই পাইয়াছ? তাহারা বলিবে, 'হঁ্যা'? তখন একজন ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া বলিবে যে, অত্যাচারীদের উপর আল্লার অভিসম্পাত:

৪৬। যাহারা লোকদিগকে আল্লার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিত এবং এই পথের মধ্যে বক্রতা অন্বেষণ করিত এবং যাহারা আখেরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাস পোষণ করিত।

৪৭। এবং (বেহেস্ত ও দোযখ) উভয়ের মধ্যে একটি অন্তরাল থাকিবে। এবং আ'রাফে (ঊর্ধ্বতনস্তরে) বহুলোক থাকিবে। তাহারা প্রত্যেককেই তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা বেহেস্তবাসীদিগকে যাহারা (এখনও) বেহেস্তে প্রবেশ করে নাই এবং (বেহেস্তে প্রবেশের) আশা করিতেছে—ডাকিয়া বলিবে তোমাদের উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হউক।

৪৮। এবং যখন তাহাদের (বেহেস্তে প্রবেশের আশা পোষণকারীদের) দৃষ্টিকে দোযখবাসীদের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভো! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী লোকদের সঙ্গী করিও না।

(ক্রমশঃ)

★

প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি রাত্রিকালে তাকুয়ার (নিষ্ঠার) সহিত কাটাইয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সহিত দিবস যাপন করিয়াছ।

কিশ্‌তিয়ে নূহ

ঃ হাদিস ঃ

মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্

(পূর্ব প্রকশিতের পর)

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس بينى وبينه نبى انه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل الى الحمرة و البياض بين ممصرتين كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يهلك الله المل كلها الا الاسلام و تقع الامنة فى الارض حتى ترتع الاسد مع الابل و تلعب الصبيان بالحيات ٥ (ابو داؤد)

হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত! হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ আমার মধ্যে এবং তাঁহার মধ্যে কোন নবী নাই এবং তিনি নাযেল হইবেন। যখন তোমরা তাঁহাকে দেখিবে, তখন তোমরা তাঁহাকে চিনিয়া লইও; তিনি মধ্যমাকৃতির পুরুষ হইবেন, লালাভ সাদা বর্ণের অর্থাৎ গন্দমী রং বিশিষ্ট হইবেন। দুইটি জরদা-রং-এর চাদর পরিহিত থাকিবেন তাঁহার কেশ এমন চকচকে হইবে যেন উহা হইতে জল বিন্দু নির্গত হইতেছে যদিও উহাতে জল স্পর্শ করে নাই। তিনি ইসলামের জন্য জনগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন এবং তিনি ধ্বংশ করিবেন, শূকর বধ করিবেন জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, তাঁহার জমানায় আল্লাহ্তালা ইসলাম ব্যতিরেকে অন্যান্য ধর্মসমূহ মিটাইয়া দিবেন, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, বাঘ ও উট এক সংগে বিচরণ করিবে, এবং সর্পের সহিত বালকগণ খেলা করিবে। (আবু দাউদ)।

উক্ত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার মধ্যে এবং আগমনকারী নবী মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মধ্যে কোন নবী নাই। আখেরী জমানায় যখন সারা বিশ্ব ধর্মহারা হইবে এবং খোদাতালা হইতে মানব জাতি দূরে সরিয়া যাইবে তখনই বিশ্বকে মুক্তি দিবার জন্য নবী আগমন করিবেন। তাঁহার আগমনের কতক লক্ষন এবং তাঁহার আকৃতির কতক বৈশিষ্ট উক্ত হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মধ্যমাকৃতি এবং সাদা লালাভ বর্ণের হইবেন। এই কথাগুলি দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ) বনি ইস্রাইল জাতির ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) হইতে আগমনকারী নবী হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

বনি ইস্রাইল জাতির নবী হযরত ঈসা (আঃ) লাল বর্ণের এবং কোকড়ান কেশযুক্ত ছিলেন। এই পার্থক্য থাকার দরুণই নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন মসিহ্ মাওউদ (আঃ) আগমন করিবেন তখন তাঁহাকে তোমরা চিনিয়া লইও, তিনি গোধুম বর্ণের অর্থাৎ লালাভ সাদা বর্ণের হইবেন। তিনি বনি ইস্রাইল জাতির ঈসা ইবনে মরিয়মের ন্যায় লাল বর্ণের হইবেন না।

জরদা রঙের কাপড়

এই কথাটি দ্বারাও নবী করীম (সাঃ) হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বনি ইস্রাইলী মসিহ্ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। কারণ নবী করীম (সাঃ) উম্মতে মোহাম্মাদীয়াতে আগমণকারী হযরত মসিহ্কে কাশ্ফ বা স্বপ্নে জরদা রং-এর দুইখানা চাদর পরা দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী ইহার তাবির

হইবে, তিনি দুইটি রোগে আক্রান্ত হইবেন। এই তাবির অনুসারে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দুইটি রোগে আজীবন আক্রান্ত ছিলেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) এইরূপ কোন রোগে আজীবন আক্রান্ত ছিলেন না। এই জন্যই আঁ-হযরত (সাঃ) এই হাদিসের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন তোমরা আগমনকারী মসিহ্‌কে চিনিয়া লইও। আর এই হাদিসের আর একটি কথা প্রাণিধানযোগ্য যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে এবং আমার মধ্যে কোন নবী নাই। এই কথাটি দ্বারা প্রতিয়মাণ হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে নবী হইবার দাবী করে তাহা হইলে তাহার দাবী সত্য হইবে না।

তিনি ইসলামের জন্য সংগ্রাম করিবেন

এই কথাটির দ্বারাও আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে বনি ইস্রাইলী মসিহ্‌ হইতে পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন, কারণ হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করিয়াছিলেন হযরত মুসা (আঃ)-এর শরিয়তকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং বিক্ষিপ্ত বনি ইস্রাইলকে জাতি একত্রিত করিবার জন্য। যথা ঃ— ইস্রাইল কুলের হারাণ মেষদের জন্য আমি আসিয়াছি।'

(মথি ১৫ ঃ ২৪)

কোরআনও এই কথাই বলিতেছে যে, হযরত ইসা (আঃ) বনি ইস্রাইল জাতির নিকট আগমন করিয়াছেন, যথা ঃ—

ورسولاً الى بنى اسرائيل -

অর্থাৎ—"তিনি বনি ইস্রাইল জাতির নিকট প্রেরিত"। হযরত ইসা (আঃ) বনি ইস্রাইল জাতির নিকট আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য আর মোহাম্মাদী মসিহের বৈশিষ্ট্য হইল তিনি,

موعود كل اقوام اديانا -

অর্থাৎ—"সমস্ত জাতির প্রতিশ্রুত"। তিনি বিশ্বের সকল জাতির নিকট আগমন করিবেন। এবং সকল জাতিকে মুক্তি দিবেন। এই জন্যই তিনি বিশ্বজনীন ইসলাম ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সকল জাতির সহিত সংগ্রাম করিবেন। এই কথাটি দ্বারাও নিশ্চিত ভাবে দুই মসিহের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

'তিনি ক্রুশ ধ্বংশ করিবেন"

فيدق الصليب

এই কথাটি দ্বারাও আঁ হযরত (সাঃ) মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে বনি ইস্রাইল জাতির হযরত ঈসা (আঃ) হইতে পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন। কারণ, ঈসা (আঃ) ক্রুশ বহন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, যথা তিনি বলিতেছেন "প্রত্যেকে নিজ ক্রুশ নিজে বহন করিয়া আমার পশ্চাতে আগমন কর" এই শ্লোক অনুসারেই তিনি তাঁহার ক্রুশ নিজেই বহন করিয়াছিলেন। আর হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য হইল ক্রুশ ধ্বংশ করা। ক্রুশ বহনকারী এবং ক্রুশ ধ্বংশকারীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। হাদিসের 'চিনিয়া লইও' কথাটির তাৎপর্য্য ইহাই।

فتامل .

'তিনি শূকর বধ করিবেন'

এই কথাটি দ্বারাও আঁ হযরত (সাঃ) হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে বনি ইস্রাইল জাতির হযরত ঈসা (আঃ) হইতে পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন। কারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) কোন প্রকার শূকরই ধ্বংশ করিতে সমর্থ হন

নাই। বরং তাঁহার সম্প্রদায়ই শূকর ও মদে মত্ত রহিয়াছে, তদুপরি তাঁহার সম্প্রদায় হইতেই শূকর বিশিষ্ট লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এই শূকর বিশিষ্ট লোকদেরকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন হইয়াছে। তিনি আগমন করিয়াই আঁ হযরতের (সাঃ) বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী শূকর বিশিষ্ট লোকদিগকে হত্যা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ আথম, ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডুই, পণ্ডিত লেখরাম পেশাওয়ারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বদদোয়ায় হালাক হইয়া গিয়াছে।

'তিনি ধর্মের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিবেন'

এই কথাটিও দুই মসিহের মধ্যে পার্থক্য রচনা করিয়া দিয়াছে। বনি ইস্রাইল জাতির ইসা (আঃ) যুদ্ধ কর উঠাইয়া দেন নাই বরং তাঁহার শিক্ষার মধ্যে ইহার বিপরিত কথাই দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে অস্ত্র শস্ত্র খরিদ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন; সে মতে তাঁহার শিষ্যবর্গ ইহুদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু আখেরী জমানার মসিহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার শিষ্য মণ্ডলিকে ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে নিষেধ করায় আজও তাঁহার শিষ্য মণ্ডলি জমাতে আহ্মদীয়া ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন নাই। আর বর্তমানে ইস্রাইলী মসিহের শিষ্য বর্গ অস্ত্র যুদ্ধে এতটুকু অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহারা সারা বিশ্বকে এটম, রকেট প্রভৃতি দ্বারা ধ্বংশ করিতে উদ্যত।

তাঁহার যুগে ইসলাম ধর্ম ব্যাতিরেকে অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে

এই কথাটি দ্বারাও দুই মসিহের মধ্যে বহু পার্থক্য রচনা হইয়াছে। পূর্বেকার মসিহের যুগে ইসলাম ধর্মের জয় দূরে থাকুক বরং তাঁহার যুগে ইসলাম নামে কোন ধর্মই ছিল না। তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী নিজদিগকে নাছারা নামে পরিচয় দিয়া থাকে এবং তাহারা জগতে প্রচার করে যে, নাছারা নাম ব্যতিরেকে মুক্তির অধিকারী আর কেহ নহে। এই জন্যই আঁ-হযরত (সাঃ) দুই মসিহের মধ্যে পার্থক্য রচনা করিয়া দিয়াছেন যে, আখেরী জমানায় উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে যে মসিহ্ আগমন করিবেন তিনি ইসলামকেই জয়যুক্ত করিবেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত, জামাতে আহ্মদীয়া সারা বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং ইস্রাইলি মসিহের শিষ্যবর্গ ইসলামকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জমাতের প্রচারের ফলে ক্রমেই সারা বিশ্ব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, এমন এক দিন আসিবে যে দিন সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখনই সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাঘে-ছাগে এক ঘাটে পানি পান করিবে। এই কথাটি দ্বারা পূর্ণ শান্তি বুঝায়।

(ক্রমশঃ)

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

এবাদত ও সমস্ত নেক আমল তখনই কবুল হয়, যখন মানব মোত্তাকী হয়। সেই সময় খোদাতায়ালা গুনাহের আহ্বায়ক সমূহকে উঠাইয়া নেন এবং সকল প্রয়োজন তিনি নিজে পূর্ণ করেন।

আসল 'তাক্ওয়া', যাহা দ্বারা মানব ধৌত ও পরিস্কৃত হয় এবং নবীগণ যাহার জন্য আসেন, তাহা দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কেহ আছে এর দৃষ্টান্ত?

قد افلح من زكها -

পবিত্রতা ও নির্মলতা উৎকৃষ্ট বস্তু। মানুষ পবিত্র ও নির্মল হইলে, ফেরেস্তাগণ তাহার সহিত করমর্দন করেন। মানুষের নিকট উহার মর্যাদা নাই। তাহা না হইলে হালাল পন্থায় প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ লাভ হইতে পারিত। চোর চুরি করে, এই জন্য যে, সে ধন দৌলত পাইবে। সুতরাং সে যদি ধৈর্য্য অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে অন্য কোন উপায়ে ধনী করিয়া দিতেন। এইভাবে ব্যাভিচারী ব্যাভিচার করে, যদি সে ধৈর্য্য অবলম্বন করিত, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহার মনোবাঞ্ছা অন্য ভাবে পূর্ণ করিয়া দিতেন, যাহাতে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ হয়। হাদিসে বর্ণিত আছে, কোন চোর চুরি করে না, যতক্ষণ সে মোমেনের অবস্থায় থাকে এবং কোন ব্যাভিচারী ব্যাভিচার করে না, যতক্ষণ সে মোমেনের অবস্থায় থাকে। কোন ছাগলের সামনে ব্যাঘ্র দাঁড়াইয়া থাকিলে যখন সে ঘাস খাইতেও সাহস করে না, তখন ছাগলের মত ইমানও মানুষের নাই। মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য হইল 'তাকওয়া'। যদি কেহ উহা অবলম্বন করিয়া থাকে তবে সে সব কিছুই পাইতে পারে। উহা ছাড়া মানবের পক্ষে কোন ছোট বড় অন্যায় হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। মানবীয় শাসন বিধান কাহাকেও গুনাহ্ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার সঙ্গে কোন রাজ কর্মচারী পাহারা থাকে না যে জন্য তাহার ভয় হইতে পারে। মানুষ নিজকে একাকী ভাবিয়া গুণাহ্ করিয়া ফেলে, নতুবা সে উহা কখনও করিত না এবং যখন সে নিজকে একাকী ভাবে, তখনই সে নাস্তিক হয় এবং তখন স্মরণ থাকে না, তাহার খোদা তাহার সাথে আছে, তিনি তাহাকে দেখিতেছেন নতুবা সে কখনও গুনাহ্ করিত না। তাক্ওয়াতেই সব কিছু। কোর-আন শরীফ আরম্ভ ইহার দ্বারা:

ایاك نعبد و ایاك نستعین -

উদ্দেশ্য হইল "তাকওয়া"। মানুষ আমল করে কিন্তু সে ভয়ে উহা নিজের দিকে আরোপ করিতে পারে না। উহাকে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য বলিয়া কল্পনা করে এবং ভবিষ্যতে এইজন্য আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য যাচনা করে। পুনরায় দ্বিতীয় সুরাও

هدى للمتقين -

দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি। সমস্ত তখনই কবুল হয়, যখন মানুষ মোত্তাকী হয়। তখন আল্লাহ্তায়ালা গুনাহের আহ্বায়ক সমূহকে উঠাইয়া নেন। স্ত্রীর প্রয়োজন হইলে স্ত্রী দেন। ঔষধের প্রয়োজন হইলে ঔষধ দেন। যে কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে, তাহাই দেন এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে রুযী দেন, যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। (মলফুজাত-চতুর্থ খণ্ড—পৃষ্ঠা ২৫১ ও ২৫২)

অনুবাদক—
ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা

॥ আমার জীবন স্মৃতি ॥

মোবারক আলী

আজ শুক্রবার, জুম্মার দিন বাংলা ১লা আশ্বিন ১৩৬০, ইং ১৯৫৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমার জীবন স্মৃতি লিখিতে বসিলাম।

দাদীর কাছে শুনিয়াছিলাম প্রথম আদম-সুমারীর বৎসরে আমার জন্ম হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৮৮১ সনে (ইং)। বাবাজানের মুখে শুনিয়াছি বাংলা ১২৮৮ সনে আমার জন্ম হইয়াছিল, দাদীর কথায় বোধ হয় শীতকালে অর্থাৎ ইংরাজী বৎসরের প্রথমের দিকে আমি ভূমিষ্ঠ হই। যেদিন ধরা যাউক আমার বয়স এখন ৭৩ বৎসর চলিতেছে। আমার শরীর এখন খুব দুর্ব্বল, স্মৃতি-শক্তি অনেক কম হইয়াছে। তবুও যতটা মনে আসে লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি; যদি ইহার দ্বারা আমার বংশের, জাতির, বা দেশের কাহারও কোনও উপকার হয়; এমন একটা দুর্ব্বলের জীবন কাহিনী দ্বারা জীবনের পথে চলিতে কেহ যদি কোন ইঙ্গিত পায়।

কোনও কোনও ইউরোপীয়ান লেখক আত্মজীবনীতে আপন আপন জঘন্য দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাতালা যাহা গোপন করিয়াছেন তুমি তাহা প্রকাশ করিও না," নীতি হিসাবেও ইহাই ঠিক, কারণ শারীরিক নগ্নতা যেমন বিশ্রী, মানসিক নগ্নতা তার চেয়েও বিশ্রী। সুতরাং আমিও হযরতের উপদেশই মানিয়া চলিব।

শৈশবের কথা কিছু মনে নাই। বাল্যকালের কথা এতটুকু মনে আছে—তখন দাদি বাঁচিয়াছিলেন; পিতা আগুনিয়াতাইড় মুন্সী বাড়ীতে গোমস্তার কাজ করিতেন। আমি দাদির সঙ্গে সোনাতলার উত্তরে বাইগুনি গ্রামে তাঁর ভাই-এর বাড়ীতে সময়ে সময়ে যাইতাম এবং তথায় ২।৩ মাস থাকিতাম। দাদির ভাই মেহেরুল্লাহ্ মণ্ডল বেশ মুসল্লি লোক ছিলেন। আল্লাহ্ রসুলের নাম খুব লইতেন এবং কোন ওয়াজ-নছিহতের মজলিশ হইলে সেখানে যাইতেন। দাদার পিতা হাজী জামালুদ্দিন জোতদার ছিলেন। শুনিয়াছি দাদা ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার যখন হজ্ব করিতে যান, তখন দাদি গর্ভবতী ছিলেন, সেই গর্ভেই পিতা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। দাদা আর ফিরিয়া আসেন নাই। পাঞ্জাবে তখন শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা হইয়াছিল, বাংলা দেশ হইতে দলে দলে লোক সেই জেহাদে যোগদান করিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করে দাদা ঐ জেহাদে গিয়া শহিদ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঠিক খবর কিছুই জানা যায় নাই।

আমার দাদার দুই স্ত্রী ছিল, দাদি ছিলেন ছোট স্ত্রী। ছোট বেলায় দেখিয়াছি দাদি বাড়ীর চারিদিকে কার্পাস ও এরণ্ড গাছ লাগাইতেন, এণ্ডি ও কার্পাসের সুতা কাটিতেন, রেড়ির তেলের বাতি জ্বালান হইত। তখন কেরোসিন তেল দেশে আসে নাই। সুতা কাটিয়া অর্ধেক দ্বারা কাপড় বুনাইতেন। অর্ধেক সুতা তাঁতী বা জোলাকে মজুরী স্বরূপ দিতেন। তখন বিলাতী কাপড়েরও প্রচলন বেশী হয় নাই। শীতকালে আমরা মোটা সুতির চাদর ব্যবহার করিতাম। তাও ধুতির অপেক্ষা বেশী মোটা নয়।

গ্রামে রিফায়েতুল্লা চাচার একটি পাঠশালা ছিল। আমি প্রথম ক খ এর ধারাপাত সেখানে পড়িতাম। মাটিতে বড় বড় করিয়া লিখিতাম। তারপর তাল পাতায়

লিখিতাম। এর পর আমি বড় ভাইদের সঙ্গে কর্পূর মধ্য বাংলা স্কুলে যাইতাম। তথায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। বার্ষিক পরীক্ষার পর ৪র্থ শ্রেণীতে প্রমশন পাইলাম। ইতিমধ্যে আমার চাচা (পিতার আপন চাচাত ভাই) ফয়েজউদ্দিন ওরফে ফজলে রহমান সাহেব মোক্তারী পাশ করিয়া বগুড়ায় মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তাঁর ব্যবসায় ভালই চলিতে লাগিল। তিনি বাড়ীর ছেলেদিগকে লেখাপড়ায় বেশ উৎসাহ দিতেন। একদিন হঠাৎ বাবাজান বলিলেন, 'বগুড়ায় চল, তোমার চাচার বাসায় থাকিয়া পড়িও, তিনিও তোমাকে চান। এরপর কর্পূর স্কুল হইতে সার্টিফিকেট লইয়া বগুড়ায় বাংলা স্কুলে ভর্তি হইলাম আবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। কর্পূর স্কুলে কোনও কোনও পণ্ডিত ছাত্রদিগকে খুব মারিতেন। আমি সেখানে মার খাইয়াছিলাম কিনা মনে পড়ে না, কারণ আমি প্রায়ই পড়া পারিতাম। বগুড়ার বাংলা স্কুলে (তখন মধ্য ইংরাজী স্কুলে) একজন বৃদ্ধ শিক্ষক খুব মারিতেন। আমি ঐ স্কুলেও বার্ষিক পরীক্ষার পর ৪র্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। চাচা আমাকে বাসায় নিজেই পড়াইতেন। তখন জেলা স্কুলে পড়া একটি সৌভাগ্য মনে করা হইত। একদিন চাচাকে বলিলাম, আমি জিলা স্কুলে পড়িতে চাই। তিনি আগ্রহের সহিত সম্মতি দিলেন এবং জিলা স্কুলে ৮ম (সর্ব-নিম্ন) শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। সেখানেও ডবল প্রমশন পাইয়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলাম। পড়াশুনায় ভাল ছিলাম বলিয়া চাচা বেশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা যেন বংশের কোনও ছেলে বেশ উন্নতি করে। তাঁর নিজের ছেলে ছিল না এজন্য আমার দিকে তাঁর নজর ছিল। খরচ তিনিও দিতেন, কিছুটা বাবাজানও দিতেন। আমি খেলাধুলা খুব ভালবাসিতাম। বৈকালে স্কুলে গিয়া খেলিতাম; কিন্তু চাচা উহা ভাল চক্ষে দেখিতেন না। আমার সম্বন্ধে তখন বাবাজানের খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, কারণ তাঁর অবস্থা ছিল খারাপ। চাচার একটি মেয়ে ছিল, আমি উকিল হইতে পারিলে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিবেন, এরূপ কথাও শুনিতে পাইলাম। সে সময়কার বগুড়ার সামাজিক অবস্থা এইরূপ ছিল যে, টাউনের প্রায় প্রত্যেক মহল্লায় একটা বেশ্যা পাড়া ছিল। বেশ্যাবাড়ী যাওয়া, একটি করিয়া রক্ষিতা রাখা সে যুগে উকিল মোক্তার আমলা ইত্যাদি ভদ্রলোকদের একটি ফ্যাসান ছিল। আমরা দিগদাইড় বাড়ী হইতে হাটিয়া বগুড়ায় আসিতাম। তখন বগুড়ায় রেল গাড়ী আসে নাই। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্রদিগকে কলিকাতায় যাইতে হইত। বগুড়া হইতে সান্তাহারে গরুর গাড়ীতে গিয়া তারপর রেলে যাইতে হইত। তখন ইংরেজের খুব প্রতাপ। ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপার, সিভিল সার্জ্জন সাধারণতঃ ইংরেজই ছিল। যখন বগুড়ায় রেল লাইন তৈয়ার হয়, (১৮৯৮।৯৯) তখন রেল সড়ক নির্মাণ কাজে রত দুই জন কুলিকে বগুড়া থানার দারোগা, কি অপরাধের জন্য জানিনা ধরিয়া থানায় আনিয়াছিলেন। **Executive Engineer Mr. Woodside** ইহা জানিতে পারিয়া থানায় আসিয়া বলেন, 'দারোগা কোথায়?' দারোগা বাবু তখন থানারই এক কোনে তাঁহার বাসায় ছিলেন। সাহেব বাসার ভিতর ঢুকিয়া বেত মারিতে মারিতে দারোগাকে বাহিরে লইয়া আসেন এবং কুলিদিগকে ছাড়াইয়া লইয়া যান। দারোগা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলে, সাহেবকে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত করা হইল, কিন্তু শেষটা সাহেব **Regret** প্রকাশ করিলে মোকর্দমা উঠাইয়া লওয়া হয়। স্কুলে আমি বড় ভাল ছিলাম না। যখন ২য় শ্রেণীতে পড়ি তখন (বর্তমান **Class - IX**) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিতে একবার দেখিলাম কবি বলিয়াছেন গণিত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা সহজ, কিন্তু সাহিত্য সাধনা বড় কঠিন; **Shakespeare** ইচ্ছা করিলে **Newton** হইতে পারিতেন কিন্তু **Newton** কখনও **Shekespare** হইতে পারিতেন না।

আমিও মনে করিলাম একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না কেন। তখন হইতে অঙ্কের দিকে বেশী মনোযোগ দিলাম। একদিন বীজগণিতের কয়েকটি Problem মাষ্টার মশায় Home exercise দিয়াছিলেন। শেষের অঙ্কটা রাত্রি ১২টা পর্যন্ত চেষ্টা করিলাম, হইল না। পরদিন সকালে আবার কিছুক্ষণ চেষ্টা করায় সমাধান হইয়া গেল। স্কুলে গিয়া দেখি সুরেশ দত্ত, শ্রীপতি রায়, যারা অঙ্কে খুব ভাল ছিল তাহাদেরো সে অঙ্কটা হয় নাই। আমার হইয়াছে, মাষ্টার মশায় অবাক হইলেন।

প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে একদিনের কথা মনে আছে—পরদিন ঈদ, আমাদের গ্রামের কয়েকটি লোক বগুড়ায় আসিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে বলিলাম "আমি বাড়ী যাইব, তোমরা আমাকে সঙ্গে নিও।" তাহারা বলিল "আচ্ছা"। আমি স্কুল হইতে আসিয়া শুনিলাম তাহারা অল্পক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছে। আমি মনে করিলাম, জোরে হাঁটিয়া গিয়া উহাদিগকে ধরিব। ফুলবাড়ী করতোয়া পার হইয়া রাজাপুরে পৌঁছিলাম। কিন্তু উহাদিগকে পাইলাম না। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অন্ধকার রাত্রি, একাই যাইব কিনা ভাবিতে লাগিলাম। সেদিন ক্লাশে পড়ার সময়ে Smiles-এর Man and gentleman প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম **"Ease makes Children; it is difficulty that makes man" "Adversity is the best teacher"** অর্থাৎ আরামে থাকিলে মানুষ শিশুর মতই অসহায় থাকে, বিপদই মানুষ গড়িয়া তোলে"। "বিপদই সর্বাপেক্ষা উত্তম শিক্ষক" ইত্যাদী। আমিও স্থির করিলাম আজ এই বিপদে পিছাইয়া যাইব না, আগাইয়া যাইব, আল্লাহ্‌তালা আমার সহায় হউন। বাঁশের একটা মোটা কঞ্চি ভাঙ্গিয়া হাতে লইলাম; ঐটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গান করিতে করিতে আরও বেগে চলিতে লাগিলাম। পচাকাতলির মাঠের ভিতর অন্ধকারে আমি একা ভূত বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না, কিন্তু অন্ধকারে বড় গাছের নিচ দিয়া যাইবার সময় গাটা শিহরিয়া উঠিত, তখন মনে মনে লাহাওলা ওলা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ্ পড়িতাম। মৌলবী সাহেবের কাছে শুনিয়াছিলাম, ইহা পড়িলে শয়তান ভূত প্রেত সব দূর হয়। যাহা হউক ভূতটুত কোথাও কিছু দেখিলাম না, ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন বাড়ীর নিকটে গজারি নদীর ধারে পৌঁছিলাম তখন নদী পার হওয়ার সমস্যায় পড়িলাম। শেষটা মনে করিতেছি, নামিয়াই পার হইব, কারণ সাঁতার জানি। এমন সময়ে কয়েকটি লোক আসিয়া পড়িল, তাহারা আমাদের পড়শী, পীরগছার হাট হইতে ফিরিতেছিল। তাহারা খুজিয়া একখানা নৌকা আনিল, পার হইয়া বাড়ী পৌঁছিলে সকলে অবাক হইল। আমি কি করিয়া একাই এত শীঘ্র সন্ধ্যারাত্রের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিলাম। আমি ভয় খাইয়া থাকিতে পারি মনে করিয়া দাদি তেতুল গুড় গুলিয়া খাওয়াইলেন। দাদি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, ছোট বেলায় তাঁহার কাছে রাত্রে থাকিতাম। শীতের সময়ে তার ঘরে আগুন পোহাইতে বেশ লাগিত। ঘুঁটাতে ভাল আগুন হয়, আমি দাদীর জন্য মাঠ হইতে ঘুঁটা কুড়াইয়া আনিতাম। রোজার সময়ে শেষ রাত্রে খাওয়ার সময়ে তিনি আমাকেও খাওয়াইতেন। বগুড়ায় আমি রওনা হইবার সময় কখনও কখনও আমাকে পয়সা দিতেন। পর দুঃখে তাঁর হৃদয় ব্যাথা পাইত সতীন পুত্র আজিমউদ্দিন যখন ঋণে জর্জ্জরিত; অনেক সময়ে তাহার হাট খরচ যখন জুটিত না, তখন দাদি তার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দূর হইতে বলিতেন, "আজীমের আজ হাট খরচ জুটিতেছে না, সেই জন্য বাবার মুখ ভার। আমার হাতে টাকা থাকিলে আমি দিতাম।"

বগুড়ার জিলা স্কুলে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন হরেন্দ্র বাবু (হরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী) ছিলেন হেড্‌মাষ্টার। এই দীর্ঘাকৃতি মানুষটিকে দেখিয়া ছাত্র শিক্ষক সকলেই খুব ভয় করিতেন। অভিভাবকগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ছাত্রদের চালচলন, পড়া শুনা কড়া নজরে দেখিতেন। শিক্ষকরা ক্লাশে কি করিতেলেন তাহা বাহির হইতে চুপচুপ করিয়া দেখিতেন ও শুনিতেন। নিয়মানুবর্তিতায় ও পরিশ্রমে তিনি সকলের আদর্শ ছিলেন। গণিত ইংরাজী প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁর বেশ বুৎপতি ছিল। স্কুলের লাইব্রেরীতে যে সকল কেতাব ছিল প্রায় সবগুলিই তিনি পড়িয়াছিলেন। এই কড়া মানুষটির হৃদয় খুব সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে তিনি প্রভেদ করিতেন না। আমার সহপাঠী মোজাম্মেল হকের পিতা শরাফৎ তরফদার ছিলেন গরীব মোক্তার। একবার মোজামের ফিস বাকী পড়ে, জরিমানা হইতেছে, কিন্তু তবুও ফিস দিতে পারিতেছে না। হেড মাষ্টার মশায় মোজামকে অফিসে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোজাম, তুমি ফিস্ দিচ্ছনা কেন? তোমার ফাইন যে বাড়িয়া যাইতেছে? মোজাম লজ্জায় কথা বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষে পানি আসিল। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হরেন্দ্র বাবু বলিলেন "যাও"। তিনি নিজ পকেট হইতে মোজামের ফিস্ ও জরিমানা দিয়া দিলেন। ইংরাজী কোনও শব্দের অর্থ বা উচ্চারণ নিশ্চিত ভাবে না জানিলে তিনি অম্লান বদনে বলিতেন "ইহা এখন জানি না, তোমাদিগকে পরে বলিয়া দিব। তিনি বলিতেন যে, না জানিয়া জানার ভান করা একটা ভণ্ডামী, ইহাতে অনেক সময়ে লজ্জাও পাইতে হয়।" আমরা তাঁহার এই গুণের প্রসংশা করিতাম। বাল্যকালে আমাদের গ্রামে দেখিয়াছি, লেখাপড়ার দিকে লোকের আগ্রহ ছিল না, আজকাল একটু হইতেছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সে সময়ে প্রায় সকলেই একরকম সুখে সচ্ছন্দে ছিল। ছেলেরা ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত গরু চরাইত ও খেলাধূলা করিয়া দিন কাটাইত। বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, এত ম্যালেরিয়া ছিল না। জমিদার মহাজনদের আধিপত্য খুব ছিল। হিন্দুদের মধ্যে ছুঁই ছাঁই যথেষ্ট ছিল। মুসলমানে ছুইলেই হুকার জল নষ্ট হইত। আমাদের গ্রামে মাত্র দুইঘর হিন্দু ছিল তারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা অবস্থাপন্ন ছিল না। প্রতিবেশী মুসলমানদিগকে ভয় করিত। পরে তাহারা ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া বগুড়ার নিকট চ্যালোপাড়ায় আসিয়া বাস করিত। আমাদের গ্রামের জমিদারেরা সব হিন্দু ছিল। তাহাদের ভয়ে গ্রামে গরু জবাই হইত না। যদি বা হইত তাহা খুব গোপনে হইত, কারণ জমিদার খবর পাইলেই পাইক দিয়া ধরিয়া লইয়া অপমান করিত ও জরিমানা করিত।

মুস্লিম গৃহস্থদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতে লাগিল। জমিদারের খাজনার সঙ্গে আবোয়াব যথেষ্ট দিতে হইত। নজরানা দিতে হইত, জমির ক্রেতাদিগকে জমা খারিজের জন্য যথেষ্ট নজর দিতে হইত, মহাজনদের নিকট টাকা ধার নিলে সুদ ছিল টাকাপ্রতি মাসিক ৵০ কচিৎ ৻৲০ ছিল; তাহাও অনেক সময়ে চক্রবৃদ্ধি হারে দিতে হইত। ফলে পরবর্ত্তীকালে অধিকাংশ গৃহস্থই ঋণে জর্জ্জরিত হইয়া ভিটেমাটী হারাইত। আমাদের গ্রামে বহুলোক এইভাবে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তীকালে গৃহস্থ সন্তান ৭।৮ বৎসর হইলেই বাপে কান ধরিয়া লইয়া গিয়া মাঠে কাজ করাইত। লোকে খাইবার মাছ দুধ সে রকম পাইত না। সারাদিন খাটিয়াও অভাব ছুটিত না, মহাজনের সুদ দিতেই সব পরিশ্রমের ফল হারাইত। স্বাস্থ্যহারা হইত। অধিকাংশ লোক ৪০।৫০ বৎসর বয়সের পূর্বেই দুনিয়ার জঞ্জাল হইতে মুক্তি পাইত। এখনও প্রায় সেই অবস্থা।

কলেজে পড়া—(১৯০০-১৯০৫)

আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল (তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষাকে এণ্ট্রান্স বলা হইত) যতটা আশা করা হইয়াছিল তারচেয়ে খোদার ফজলে বেশ একটু ভালই হইয়াছিল। ২য় বিভাগে পাশের আশা ছিল। কিন্তু ড্রইং সহ ১ম বিভাগে পাশ করায় একটা বৃত্তি পাওয়ার আশা হইল। কারণ তখন মুস্লিম ছেলে খুব কম পাশ করিত। ১ম বিভাগে আরো কম। পরীক্ষার ফল দেখিয়া আত্মীয় স্বজন খুব আনন্দিত হইল, বিশেষ করিয়া চাচা। জুলাই মাসে (বর্ষাকালে) তিনি নিজেই আমাকে কলেজে ভর্ত্তি করার জন্য রাজশাহীতে লইয়া গেলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ১৯০০ সনে প্রথম বগুড়া হইতে সান্তাহার যাত্রাবাহী রেলগাড়ী চলিতে থাকে। তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য বগুড়ায় কোন কেন্দ্র ছিল না, কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষা দিতে হইত। বগুড়া হইতে সান্তাহারে যাইতে হইত, সেখান হইতে রেলে কলিকাতায় যাইতে হইত। আমরাই বগুড়া জেলাস্কুল হইতে ৭জন প্রথম ব্যাচ্ বগুড়া হইতে সান্তাহারে রেলে গিয়াছিলাম। প্রথম রেলে চড়ার সে কি আনন্দ!

রাজশাহী কলেজে (F. A.) এফ্, এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হওয়ার কয়েকদিন পরেই অসুস্থ হইয়া পড়িলাম, বাবাজানকে সংবাদ দেওয়া হইল, তিনি গিয়া আমাকে বগুড়ায় আনিলেন। তথায় আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতা মাদ্রাসায় প্রাপ্ত "আমিরে কবীর" নামক একটি (মাসিক) ১০ টাকার বৃত্তি আমাকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতা মাদ্রাসায় গিয়া ভর্ত্তি হইলাম। তখন ঐ মাদ্রাসার এফ্, এ, ক্লাশ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐ ক্লাশ এক সঙ্গে বসিত। মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য আলাদা কয়েকখানা বেঞ্চ ও রেজিষ্টার বা "রোল-কল" ভিন্ন ছিল; কিন্তু একই অধ্যাপক পড়াইতেন আমরা মাদ্রাসায় ২৲ ফিস দিতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিস ছিল ১২৲। মির্জাপুর মহল্লায় ২১ নং বুদ্ধু ওস্তাগার লেনে একটি মেছে থাকিতাম। স্কুলে পড়াকালে যাত্রাগান শুনার খুব ঝোক ছিল। কলিকাতায় গিয়া থিয়েটার দেখার ঝোক হইল। কোন সপ্তাহেই থিয়েটার দেখা বাদ যাইত না। বৃত্তির টাকা হইতে কোন কোন সময়ে বগুড়ার একটি ছাত্র বন্ধুকে সাহায্য করিতাম, সে বড় অনটনের মধ্য দিয়া জায়গির থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সে যুগে বোধ হয় শতকরা ৯০ জন মুস্লিম ছাত্র জায়গীর থাকিয়া কলেজে পড়িত। আজও বোধ হয় ঐরূপ ছাত্রের সংখ্যাও শতকরা ৫০ জনের কম নয়। অবস্থাপন্ন জমিদার; ব্যবসায়ী শ্রেণীর মুস্লিম ছেলেরা লেখাপড়ার বড় ধার ধারিত না। নিতান্ত গরীবরাও না, মধ্যবৃত্ত গরীব শ্রেণীর মুস্লিম ছেলেরাই কিছু কিছু লেখাপড়া করিত। জায়গীরে থাকিয়া তাহারা স্বাস্থ্য, মনের বল ও তেজস্বিতা সব হারাইত।

এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী প্রমুখ সমগ্র ভারতমান্য নেতা ছিলেন; কিন্তু মুস্লিম জন-সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কিছু অধিক হওয়া স্বত্বেও মুসলমানদের মধ্যে সেরকম কোনও নেতা হয় নাই। ইহার কারণ ঃ—

(১) মুসলিমদের চরিত্রের অবনতি। ইসলামিক আদর্শ হইতে বিচ্যুতি। মৌলবীগণ যে আদর্শ সমাজের চক্ষে ধরিত তাহার দ্বারা উন্নত চরিত্রের লোক গড়িয়া উঠিতে পারিত না। স্বাধীন চিন্তা মুসলিমদের মধ্যে ছিল না বলিলেও হয়। বাংলার উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমগণ নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলীর (মেটেবুরুজের) অনুকরণ করিত।

(২) নূতন কোনো আদর্শও তাহারা গ্রহণ করে নাই।

(৩) ইংরাজ শাসকগণ সরকারী ভাষা পার্শির পরিবর্তে ইংরেজী প্রবর্তন করেন। ফলে যে মুসলিমগণ সরকারী কার্যে উচ্চপদগুলি দখল করিয়া ছিল, মোল্লাদের ফতোয়ার দলে ইংরেজী কাফেরি ভাষা বলিয়া বর্জ্জন করায় তাহাদের পদগুলি হিন্দু ও

অমুসলিমগণ ক্রমশঃ দখল করিয়া বসিল। ফলে চাকুরে, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ইত্যাদি সব হিন্দু হইয়া পড়িল। ব্যবসাও তাহাদের হাতে গেল। এক সমাজের অর্থ অন্য সমাজ শোষণ করিতে লাগিল। মুসলিম ঘুস খাইত না; কিন্তু উচ্চহারে সুদ দিত। এই সব কারণে সমগ্র মুসলিম সমাজ একেবারে নিস্ব হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩ক) ইংরাজ সরকার কয়েক কোটি টাকা মূল্যের মুসলিমদের লাখেরাজ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় মুসলিম সমাজের অর্থনীতি আর এক বিষম ধাক্কা খাইল। হাজার হাজার মুসলিম ভদ্র ঘর নিঃস্ব হইল এবং হাজার হাজার অবৈতনিক মাদ্রাসা মক্তব বন্ধ হইয়া গেল।

(৩খ) বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা মুসলিমদের মধ্য হইতে চলিয়া গেল। চাষবাসই তাহাদের এক মাত্র সম্বল রহিল; মুসলিমদের এক ঘোর অন্ধকার যুগ আসিয়া গেল।

(৪) জায়গীরে থাকিয়া মুসলিম ছাত্রগণের মধ্যে **Inficiority Complex** অর্থাৎ "আমরা সামান্য শক্তিহীন" এই রকম ভাব আসিয়া গেল। ইহাদের মধ্য হইতে বড় নেতা কি করিয়া হইতে পারে?

মুসলিম ছাত্রগণ ও যুবকগণ যাত্রাগান ও থিয়েটার দেখিয়া, ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিত; কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলাম ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে সাহিত্য না থাকায় নিজদের ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিত না। মোল্লা মৌলবীদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও দারিদ্র ইহার অন্যতম কারণ।

কলেজে ভর্তি হওয়ার অল্পদিন পরেই বাজারহাট কান্দাপাড়া নিবাসি উকিলউদ্দিন খন্দকারের সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি আমাদের মেছে থাকিতেন। তদানিন্তন এ্যালবার্ট কলেজে এফ, এ, ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত চরিত্রবান এবং সত্যপরায়ন লোক ছিলেন। পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার পরে সরকারী চাকুরী পাওয়ার লোভে প্রায় সকলেই প্রকৃত বয়স গোপন করিয়া কম বয়স লেখাইত। কিন্তু ইনি দরিদ্র হইলেও তাহা করেন নাই। পরে আমি যখন ইলিয়ট হোষ্টেলে ভর্তি হইলাম তখন ইনিও তথায় গিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে ডিসেম্বর মাসে বড় দিনের বন্ধে আমি তাঁর অনুরোধে কলিকাতাতেই থাকিয়া গেলাম। এক দিন আমাকে একলা সঙ্গে লইয়া শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেলেন। তথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? "আমি কিছু উচ্চাশার কথাই বলিলাম। উনি বলিলেন, 'যদি উচ্চলক্ষ্য সাধন করিতে চাও তবে থিয়েটার দেখা ছাড়ো, এতে সুধু সময় নষ্ট হয় না, নৈতিক অবনতিও ঘটে।" আমি একটু ইতস্তঃত করিতেছিলাম; কিন্তু উনি জেদ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আচ্ছা"। উনি বলিলেন "আমার হাত ধরিয়া প্রতিজ্ঞা কর বি, এ, পাশ করার পূর্বে আর থিয়েটার দেখিবে না।" আমি তাহাই করিলাম। থিয়েটার ছাড়িলাম। বি, এ, পাশ করার পর থিয়েটার দেখিতে গেলাম; কিন্তু আর পূর্বকার মত আনন্দ লাভ করিলাম না।

উকিলউদ্দিন আদর্শবাদী ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক ছিলেন। একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক স্কুলে তার চরিত্রের উপর বেশ একটা ছাপ দিয়াছিলেন। এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া এক বন্ধুর সঙ্গে উকিলউদ্দিন উন্নত ভাগ্যের সন্ধানে অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য রেঙ্গুন পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া জানিতে পারিলেন যে, অষ্ট্রেলিয়াতে প্রবেশের দ্বার সুধু সাদা আদমীদের জন্য খোলা, অন্যদের জন্য বন্ধ। রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় মির্জাপুর রোডের এম, এল, জুবিলি লেস্কু

মাষ্টারী করিতে লাগিলেন ; তৎসঙ্গে প্রাইভেট মাষ্টারীও করিতেন। ছোট ভাই নকিবুদ্দিনকে কটক মেডিক্যাল স্কুলে পড়াইবার জন্য আমি ১৯০৫ সনে বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার A, P, ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ হাইস্কুলে মাষ্টারী করিতাম ও ল পড়িতাম। ওকালতী ব্যবসায় আমার পছন্দ হইত না তবুও ল লেকচারে এ্যাটেণ্ড করিতাম, চাচার আগ্রহের জন্য। কিন্তু চাচার নিজের মোক্তারী জীবন দেখিয়া আইন ব্যবসায়ের প্রতি আমার অভক্তি জন্মিয়াছিল। ল ক্লাশে দেখিতাম প্রায় ছাত্রই প্রক্সি দিয়া উপস্থিত লেখাইত। আইন ব্যবসায় যাহারা করিবে তাহারা কলেজ হইতেই মিথ্যা আচরণ অভ্যাস করিতেছে দেখিয়া ঐ ব্যবসায়ের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেল।

কলিকাতা মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে এক বন্ধু আমাকে **Review of Religions** পত্রিকা দেখাইল। সেই হইতে আহ্‌মদীয়া মতবাদের সহিত আমার পরিচয় আরম্ভ। **Review of Religions** এর নামাজ বা উপাসনা সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ (হযরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ (আঃ) সাহেবের লেখা একটি প্রবন্ধ (তরজমা) পড়িয়া আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। নমাজকে এদেশের মৌলবী সাহেবরা আল্লাহ্‌তালার একটি ট্যাক্স বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। নমাজের ট্যাক্স না দিলে দোজখের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এইজন্য নমাজ অবশ্য পড়িতে হইবে ; নমাজী কিছু বুঝুক বা না বুঝুক এই ট্যাক্স দিতে হইবে নচেৎ এক ওয়াক্ত নমাজ কাজা হইলে আশি হপ্‌তা দোজক ভোগ করিতে হইবে। **Review of Religions**-এ প্রকাশিত নমাজ সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে ইহাই আলোচনা হইয়াছিল যে, নমাজ আল্লাহতালার ট্যাক্স নয়, বান্দা নমাজ না পড়িলে আল্লাহ্‌তালার কিছু আসে যায় না। নমাজ মানুষের নিজের জন্যই আবশ্যকীয়। ইহা রুহ্‌ বা আত্মার খোরাক। বাহ্যিক খাদ্য যেমন শরীরের পুষ্টির জন্য দরকার, আত্মিক খোরাকও তেমনি আত্মার উন্নতির জন্য দরকার। প্রবন্ধটির যুক্তিগুলি এত স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ যে, হৃদয় সহজেই গ্রহণ করে।

এই সময় হইতে আমি রিভিউ পাঠ করিতাম এবং ইহা লইয়া বন্ধু বান্ধবদের সাথে আলোচনাও করিতাম। কেহ বলিলেন মির্জা সাহেবের ইস্লামের বিধান গুলির ব্যাখ্যা খুব সুন্দর, কিন্তু তাঁহার এমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী মিথ্যা। উচ্চ শিক্ষিত, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিই এই রূপ মনে করিতেন এবং করেন। এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা মনে আছে। কলিকাতা মাদ্রাসার টিচার্সরুমে শিক্ষকদের মধ্যে একদিন হযরত মির্জা সাহেব (আঃ) সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, এক তরুণ শিক্ষক বলিলেন, "মির্জা সাহেব যে সকল মোজেজা বা কেরামত দেখান সেগুলি তো খুব আশ্চর্য্য-জনক, একজন মিথ্যাবাদী বা ভণ্ডের দ্বারা ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?" একজন প্রৌঢ় শিক্ষক, যিনি একজন বিখ্যাত পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মির্জা সাহেব সাধন বা আমল দ্বারা কয়েকটি জিনকে বশ করিয়াছেন। সেইসব জিন দ্বারা তিনি মোজেজা দেখান। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই ; বুঝলে এখন" ? সকলে হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ ঐ রকম কিছু একটি হবে।"

এই সময় (১৯০৫-৬) এবং ইহার পরও কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমি নিজে নিজে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতেছিলাম। ইসলাম ধর্মে (এদেশের মৌলবীদের প্রচারিত ইসলামে) আমার ষোল আনা বিশ্বাস ছিল না, সেইজন্য নামাজের দিকে মনোযোগ ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজে যাইতাম, বাইবেলও পড়িতাম, হিন্দুদের রামকৃষ্ণ মতবাদও দেখিতাম। অশ্বিনী কুমার দত্তের ভক্তিযোগ কয়েকবার পড়িয়াছিলাম। রামকৃষ্ণের জীবনচরিত ও কথামৃত পড়িতাম, রামকৃষ্ণের কোনো

কোনো কথা খুব ভাল লাগিত, যথা :—"ভগবানকে এই জীবনে এবং এই পৃথিবীতেই পাওয়া যায়।" বেলুর মঠে গিয়াছি, রামকৃষ্ণ যেখানে সাধনা করিতেন সেই দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দেখিতেও গিয়াছি। উকিলউদ্দিন খন্দকার আমার সঙ্গে ছিলেন। তখন তিনি লায়েক জুবিলী স্কুলে কাজ করিতেন। ঐ স্কুলের স্থাপয়িতা চৌধুরী মোহাম্মাদকে লায়েক সাহেব খন্দকার সাহেবকে বেশ স্নেহ করিতেন, স্কুলের কাজকর্ম সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শও অনেক সময় লইতেন। বেলুর মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হইল, আলাপ হইল। প্রায় সকলেই বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট—গেরুয়া পরা। গেরুয়াধারী একজন আমেরিকানকেও দেখিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যেই আমি এদেশে আসিয়াছি। আমি বলিলাম, "আপনি কি প্রকার সাধনা করেন।" তিনি রামকৃষ্ণের বড় একটা বাঁধানো ছবি দেখাইয়া বলিলেন, "উহা পূজা করি এবং ঐ মূর্তি ধ্যান করি।"

রামকৃষ্ণের কোনো কোনো কথা ভাল লাগিলেও তাঁর অন্য কতকগুলি বিষয় আমি পছন্দ করিতাম না। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন সব ধর্মই সমান, সব ধর্মের ভিতর দিয়া ভগবানকে লাভ করা যায়। পৌত্তলিকতা, একেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ সবকে কি সমান বলা যায়? রামকৃষ্ণের ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার, জগৎগুরু ইত্যাদি বলেন; কিন্তু তাঁর হিন্দু ধর্মে যে সব গলদ আছে, যথা :—জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাঁহার স্ত্রী যখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে "মা" "মা" বলিয়া আহ্বান করিলেন। কামিনি কাঞ্চন ত্যাগ কর বলিতে বলিতে তাঁর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার ঘুমের সময়ে যদি কেহ তাঁহার হাতে টাকা দিত তাঁহার হাত নাকি তেড়িয়া হইয়া যাইত।

ইসলাম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন মনে জাগিত। নমায বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে আরবীতে পড়া, সুদ, বহু বিবাহ, অবরোধ ও পর্দা, চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া, সঙ্গীত বর্জন ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাল ভাল আলেমদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইতাম না। মুসলিমদের ধর্মাচরনের মধ্যে শাঁসশূন্য একটা খোলস দেখিতাম।

ব্রাহ্মধর্ম অনেকটা ভাল লাগিত; কিন্তু তার মধ্যেও যুক্তিই এক মাত্র প্রধান অবলম্বন। ৫০।৬০ বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ যেন তার জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলিল। সমাজের বিধানগুলি সর্বাঙ্গীন নয়; বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কোনও নিজস্ব বিধান নাই। অল্প সংখ্যক, ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অ পামর জনসাধারণের মধ্যে ইহা মোটেই প্রবেশ করে নাই।

খৃষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদে অন্ধবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ঐ সময় আমেরিকার গভীর চিন্তাশীল লেখক ইমার্সনের লেখাও পড়িতাম। ইমার্সনের লেখা আমার খুব ভাল লাগিত। তাঁর **Oversoad spiritual laws, Compansation, Representative men** ইত্যাদি বার বার পড়িয়া শান্তি লাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার চিন্তাধারা স্বাভাবিক এবং গভীর ও স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

আমার চাকুরি

১৯০৫ সনে বি. এ. পাশ করার পর আলীগড়ে গিয়া ইতিহাসে এম, এ, পড়ার আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার চাচা মোক্তার সাহেব, যাঁর নিকট শিক্ষা বিষয়ে আমি খুব ঋণী, মত দিলেন না। বরাবরই তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিলাম, সুতরাং এ বিষয়েও

তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যাইতে পারিলাম না। তিনি মোক্তারী ব্যবসায় করিয়া বেশ আয় করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেন আমি বড় কোন চাকুরী করি, অন্যথায় বগুড়ায় ওকালতী করি। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্য দরখাস্ত করিলাম। তখন নমিনেশনে ঐ সব চাকুরী হইত, কোনো পরীক্ষা ছিল না। ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট জি. এন. গুপ্ত নমিনেশন দিলেন। দার্জিলিংএ জেলা মাজিষ্ট্রেটদের ও বিভাগীয় কমিশনারের কনফারেন্সে রাজশাহী বিভাগের সব জেলা হইতে নমিনেশন প্রাপ্ত প্রার্থীদের ইণ্টারভিউ হইল, আমিও গিয়াছিলাম। আমার ইণ্টারভিউ বোধ হয় ভালই হইয়াছিল। আমিও কয়েকজন প্রার্থী **Lewes' Jubiler Sanitarium**-এ থাকিতাম। দার্জিলিঙ্গে ৮।১০ দিন ছিলাম। বগুড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হওয়ার সময়ে একজন খ্রীষ্টিয়ান পাদরি, যিনি ষ্টেশনে খ্রীষ্ট-ধর্ম সম্বন্ধে বই বিক্রি করিতেন, আমার হাতে **Thomas A Campes** এর **Invitation of Christ** বইখানি দিয়া বলিলেন, "খুব ভাল বই, রাস্তায় পড়িবেন।" আমি ।৵০ পয়সা দিয়া বইখানা লইলাম।

দার্জিলিংএ অবস্থান কালে তিনটি জিনিস আমাকে অভিভূত করিয়াছিল।

১। হিমালয়ের বিরাট, মহান, মনোহর ও অতুলনীয় দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা প্রকাশ করার জন্য যেন এভারেষ্ট শুভ্র মস্তক উত্তোলন করিয়া চিরকাল অবিরাম ভাবে ঘোষণা করিতেছে, হে জগদ্বাসী আমার মহিমাময় স্রষ্টার মহিমা দর্শন কর, সকল ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ত্যাগ কর, সেই মহান স্রষ্টার পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িয়া ধন্য হও।

২। **Thomas A Campes**-এর বই **Invitation of Christ.**

৩। এক ব্রাহ্ম প্রচারকের প্রত্যুষে তানপুরা সহ গান "জাগো জাগো, নয়ন মেল, দয়াময় প্রভুর গুণকীর্তন কর।" ঠিক শব্দগুলি আমার মনে নাই, তবে ঐ রকম গোছের। তিনি স্যানিটারিয়ামের বারান্দা দিয়া, সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন অধিকাংশ লোক ঘুম ঘোরে থাকিত, পায়চারি করিতেন এবং তানপুরা বাজাইতে বাজাইতে মৃদুস্বরে গান করিতেন। তাঁহার গান শুনিয়া আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।

কমিশনারের কনফারেন্সে ইণ্টারভিউ-এর সময়ে আমি যে সব উক্তি করিয়াছিলাম তন্মধ্যে দুটি উক্তি ঠিক সত্য ছিল না। একটী হইল বয়স সম্বন্ধে—আমি দরখাস্তে ২৪ বৎসর লিখিয়া দিয়াছিলাম, মুখেও তাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বয়স সঠিক জানা ছিল না। এমন কি তখন আমার পিতাও ঠিক বলিতে পারিতেন না। ২৫ বৎসরের অধিক হইলে চাকুরী পাওয়া যাইবে না, সুতরাং আমি ২৪ বৎসর বলিয়াছিলাম। ২য় উক্তি বপা গ্রামের খান বাহাদুর মহিউদ্দিন (তখন তিনি খান বাহাদুর নন) বেহারের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দূর সম্পর্কীয় একটু আত্মীয়তাকে নিকট আত্মীয়তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম—কারণ সে যুগে ডেপুটিগীরির জন্য পরীক্ষা ছিল না, বংশমর্যাদ চাকুরীর জন্য বিশেষ সহায়ক ছিল। মনটা উপরোক্ত দুইটি কারণে সংসারিক ভাব হইতে উর্ধে উঠিতেছিল, একটা আত্ম-গ্লানী অনুভব করিলাম। আমি যে চাকুরীর প্রার্থী সে চাকুরী পাইলে—যে মিথ্যা উক্তি করে তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, আর আমি মিথ্যা উক্তি করিয়াই সে চাকুরী চাহিতেছি, ইহা অপেক্ষা ভণ্ডামী আর কি হইতে পারে? দুই এক দিন চিন্তা করিলাম তারপর কমিশনার সাহেবের নিকট একটা চিঠি লিখিয়া জানাইলাম যে, বয়স সম্বন্ধে ও মহিউদ্দিন পরিবারের সহিত আত্মীয়তা সম্বন্ধে ইণ্টারভিউতে আমার উক্তি ঠিক হয় নাই। এখন আমার বিবেক আমাকে দংশন করিতেছে, সেই জন্য এই পত্র দ্বারা জানাইলাম।

মিথ্যা বলিয়া বড় চাকুরী লওয়া অপেক্ষা নিজ হাতে লাঙ্গল চালাইয়া জীবিকা অর্জন করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। তখন ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ছিল। মনে করিয়াছিলাম এই চিঠি লেখার ফলে চাকুরী নাও পাইতে পারি, অথবা সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও হইতে পারি। যাহা হউক সত্য কথা বলিয়া চাকুরী লাভে বঞ্চিত হওয়ায় কোন দুঃখ নাই।

দিন দুই পরে মিঃ জি, এন, গুপ্তের এক চিঠি পাইলাম—"আগামীকল্য আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করিবে, অন্যথা না নয়, বিশেষ জরুরি কথা আছে।" তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "তোমার তো চাকুরী হওয়ার আশা ছিল, কিন্তু এরূপ পত্র কমিশ্‌নার সাহেবকে লিখিয়াছ কেন?" আমি বলিলাম, "স্যার, চাকুরীর লোভে **Interview**-এর সময়ে যা বলিয়াছিলাম তা ঠিক সত্য ছিল না বলিয়া পরে বড় আত্মগ্লানী হইয়াছে; সেই জন্য চিঠিখানা লিখিয়াছিলাম।" "তিনি বলিলেন, "বয়স তো দরখাস্তেও ঐ দিয়াছিলে?" আমি বলিলাম—"হাঁ দিয়াছিলাম ঐ চাকুরীর লোভে। পরে মনে হইয়াছে মিথ্যা বলিয়া এমন চাকুরী লইব—যাহাতে মিথ্যাবাদীকে শাস্তি দিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক ভণ্ডামী আর কি হইতে পারে?" তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য এই লাইনের চাকুরী ঠিক হইবে না, তুমি এই চাকুরী পাইবে না। তুমি বরং শিক্ষা বিভাগে যাও।"

ফিরিয়া আসিয়া বগুড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে প্ল্যাটফর্মে নামামাত্র পাবনা জেলার একটি বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "আমি আপনার জন্য আপনাদের বাসায় তিন দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আজ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" "আমাদের গ্রাম সাহাপুরে একটি হাইস্কুল স্থাপন করা হইয়াছে, তার জন্য একজন হেড্ মাষ্টার দরকার। মুসলমান হইলেই ভাল হয়, তাই আপনার কাছে আসিয়া ছিলাম।" আমি মনে মনে বলিলাম আল্লাহ্‌তালার বুঝি ইহাই ইচ্ছা। তাঁহাকে বলিলাম, "থাকুন। দুই এক দিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে যাইব।" এইরূপে জীবনের প্রথম চাকুরী ছিল হেড মাষ্টারী এবং শেষ চাকুরীও ঠিক ঐ রকম ছিল। ইহা ছিল পূজার বন্ধের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে। বন্ধের পরে চাচা অমত করায় আর সে চাকুরীতে গেলাম না।

তারপর কল্‌কাতায় গিয়া সিটি কলেজের ল ক্লাশে ভর্ত্তি হইলাম এবং কল্‌কাতা মাদ্রাসায় এংলো-পার্শিয়ান ডিপার্টমেণ্টে ৩০৲ টাকা মাহিনার একটি মাষ্টারীও জুটিয়া গেল। আমার বন্ধু বগুড়ার মোজাম্মেল হকও তখন বি.-এ, পাশ করিয়াছিল, সেও আরবী ডিপার্টমেণ্টে ঐ মাদ্রাসাতেই মাষ্টারী পাইয়া গেল। আমরা দুইজন কিছুদিন বৈঠকখানা রোডে মির্জাপুর মস্‌জেদের এক হুজরাতে (ছোট কামরায়) থাকিতাম। সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ময়মনসিংহ গফরগাঁয়ের আবদুল জব্বার সাহেব তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "মক্কা শরীফের ইতিহাস" ছাপাইবার জন্য কল্‌কাতায় আসিলেন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকিতেছিলেন। একদিন স্কুলে যাওয়ার সময়ে দেখিলাম তিনি পাউরুটি, চিনি ও বরফ আনিয়া বারান্দায় বসিলেন। আমরা বলিলাম, 'কি হইয়াছে? এসব কেন?" জব্বার সাহেব বলিলেন "কাল তিন জায়গায় চা খেয়ে পেটটা গরম হয়েছে, কয়েকবার দাস্তও হয়েছে, তাই ভাত খাব না, ঠাণ্ডা জিনিস খেতে ইচ্ছা করছে।" তাঁর চেহারাটা যেন একটু মলিন হইয়া গিয়াছে। আমরা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলাম। সন্ধার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া দেখি জব্বার সাহেবের অবস্থা খারাপ। ব্যাপার কি? বল্লেন, "আপনারা যখন গিয়াছেন সেই হতে দাস্ত হচ্ছে, এতক্ষণ অতিকষ্টে পায়খানায় গিয়াছি, কিন্তু আর যেতে পার্‌ছিনা।

পাতলা পানির মত দাস্ত হচ্ছে, শরীরটা অবস হয়ে গেছে, আর চলে না।" দেখিলাম তাহার কাপড় ভিজা, কেমন একটা গন্ধ বাহির হইতেছে। নিকটেই এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে দেখান হইল, তিনি বলিলেন ডায়ারিক কলেরা। "আপনারা ভয় পাবেন না।" মোজামের ছোট ভাই আফজালকে বলিলেন, "উহা অন্যত্র সরাইয়া ফেলুন, ছোট ছেলেরা সহজে সংক্রামিত হয়, আপনারা এখানে কিছু খাবেন না, বাহিরে খাবেন, খাওয়ার পূর্ব্বে হাত মুখ বেশ করে ধুয়ে নিবেন। খালি পেটে থাকবেন না, ক্ষুধা হওয়ামাত্র কিছু খেয়ে নিবেন। আপনারা রোগীর সেবাশুশ্রূষা করতে থাকুন, কলেরার মল গায়ে লাগলে ভয় নাই; রোগের বীজ পেটে না গেলে এ ব্যারাম হয় না, মল গায়ে মাখলেও হবেনা।' জব্বার সাহেবের পিতাকে টেলিগ্রাম দিয়া আমরা যথাসাধ্য রোগীর সেবা করিতে লাগিলাম। রোগীর প্রস্রাব আগেই বন্ধ হইয়াছিল, অনেক পরে দাস্ত বন্ধ হইল; কিন্তু প্রস্রাব হইল না। ডাক্তার খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিলেন শশার রসে প্রস্রাব আনে। তখন ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্র মাস। বাজারে শশা পাওয়া গেল, উহার রস খাইয়া রোগী প্রস্রাব করিল। ডাক্তার বলিলেন, আর ভয় নাই। একদিন পর ভোর ৪টার সময়ে জব্বার সাহেবের পিতা তাঁর বেয়াইকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। জব্বার সাহেব পিতাকে বলিলেন, "মৌলবী মোবারক আলী সাহেব আমার ভাই, তিনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আল্লাহ্‌তালা আপনাকে বাঁচাইয়াছেন।"

আবদুল জব্বার সাহেব এরপর আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি আহ্‌মদী হওয়ার পর আমার আহ্বানে তিনি আহ্‌মদীয়া জমাতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এক সময়ে আমাকে জীবন দান করিয়াছিলেন, এখন ধর্ম্ম-দান করিলেন।"

সে বোধ হয় ১৯০৭ সনের কথা। সিটি কলেজের ল ক্লাশ ৮টার সময়ে হইত। অনেক ছাত্রই প্রক্সি দিয়া উপস্থিত লেখাইতো। আমি তাহা পারিতাম না। আইন পড়া মন্দ লাগিত না; কিন্তু আইন ব্যবসায় আমার ভাল লাগিতো না। একদিন ল ক্লাশের পরে ফিস দিতে হইল বলিয়া ৯টার পরেও কিছুক্ষণ সিটি কলেজে ছিলাম। ১টার সময়ে স্কুল বসে। একটী ছোট্ট কচি ছেলে আসিল। আমাকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "তোমার নাম কি?" আমি বলিলাম, "নামের দরকার কি? তোমার নাম আগে বল।" সে তার নাম বলিল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আমার নাম বলেছি, তুমি তোমার নাম বল।" "মোবারক আলী।" শুনিয়া ছেলেটি বলিল, "এতো মুসলমানের নাম।" "আমি মুসলমান।" শুনে ছেলেটি বল্ল, "না তুমি মুসলমান নও, মুসলমানরা তো কালো নোংরা হয়, তুমি তো পরিষ্কার ভদ্রলোক।" আমি মনে মনে ভাবিলাম তৃণখণ্ড উড়িতে দেখিলেও বাতাসের দিক বুঝা যায়। হিন্দু সমাজ সাধারণতঃ মুসলমানদিগকে কি মনে করে এই ছেলেটির কথাতে তা বুঝা যায়।

কলিকাতা মাদ্রাসায় মাষ্টারী করার সময়ে একবার আমাকে ৫০৲ মাহিনায় স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হইল বলিয়া কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আমি সে কাজে যোগদান করি নাই। ল লেকচার শেষ করিয়া কিছু দিন বগুড়ায় আসিয়া বসিয়া থাকি। ইতি মধ্যে সংবাদ পাইলাম ফরিদপুর সেটেল্‌মেণ্টে ১০০৲ মাহিনায় কাননগো লইতেছে। দরখাস্ত করা মাত্র নিযুক্তিপত্র] পাইলাম। এই চাকুরী প্রায় বৎসরাধিক কাল করিয়াছিলাম; কিন্তু ভাল লাগিল না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া আবার বগুড়ায় আসিয়া বি. এল. পরীক্ষার জন্য একটু পড়া শুনা

করিতে লাগিলাম। আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া পেটের ব্যারামে (Dispepsia) ভুগিতে ছিলাম। কাননগোগিরি চাকুরী লওয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, খোলা মাঠে খোলা বাতাসে হাটাহাটি কাজ কর্ম করিতে হইবে ইহাতে পেটের ব্যারাম সারিতে পারে, স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে; কিন্তু তা হইল না। ঐ চাকুরীতে থাকা-কালিন অবসর সময়ে একটু একটু পড়াশুনা করিতাম। এমার্সন, গোয়েটের ফাউস্ট, কোরানের ইংরেজি অনুবাদ, বাইবেল, রামকৃষ্ণ কথামৃত ইত্যাদি কয়েকখানা বই সঙ্গে ছিল। সত্যানুসন্ধান, ধর্ম চিন্তা একটু একটু করিতাম। এই সময়কার কয়েককটি স্বপ্ন আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১ম স্বপ্ন—দেখিলাম আমাদের দিগদাইড় গ্রামের বাড়ীর ঠিক উত্তর ধারের বাড়ীর জিয়ার প্রামানিককে কাহারা যেন খুব নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি যেন দুঃখ প্রকাশ করিতেছি এবং বলিতেছি, হায়, এই নিরিহ লোকটাকে কে এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করিল?

১৯৩৩ সালে স্বপ্ন দেখার ২৫ বৎসর পরের কথা (তখন আমি রংপুরে) খবর পাইলাম উক্ত জিয়ারের পুত্র গমির আর কয়েকজন চোরের সঙ্গে বারোঘরিয়া গ্রামে এক বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া বাড়ীওয়ালা কর্তৃক দা দ্বারা মাথায় এরূপ গুরুতর ভাবে আহত হয় যে, সে তৎক্ষণাৎ নিজ গ্রামের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। অন্য চোরেরাও তাহার সঙ্গে দৌড়িয়া পালায়। সমস্ত রাস্তায় রক্ত পড়িতে থাকে। দিগ-দাইড়ের নিকট রাস্তার ধারে মাঠে বসিয়া রক্তপাত বন্ধ করার বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা অকৃতকার্য হয়। তখন রাত্রেই পরামর্শের জন্য পাছপাড়ার আছ্‌তুল্লা আকন্দের ছোট ভাই মতি আকন্দকে (যে গরুর চিকিৎসা করিত) ডাকিয়া আনে। সেও রক্ত বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও সফল হয় না। তখন সে অন্য চোরদিগকে পরামর্শ দিল যে, গমিরকে একেবারে মারিয়াই ফেল, নচেৎ সকলেই ভয়ানক বিপদে পড়িবে। তখন উহারা গমিরকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গমিরও খুব বলিষ্ঠ লোক ছিল। শুনা যায় তাহার সঙ্গে যে ধস্তাধস্তি হইয়াছিল তাহাতে ঐ জমিনের কার্তিক মাসের নরম মাটিতে বেশ দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক সে একা, ২।৩ জনের সঙ্গে পারে নাই, শেষটা নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া নিকটস্থ বিলের ধারে এক বোনাধানের জমিতে পানির ভিতর ধানের গাছের নিচে তাহার লাশ গুজিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। অতি প্রত্যুষে এক ব্যক্তি মাছ মারিতে আসিয়া যখন ঐ ধানের উপর ছাপ মারে তখন ঐ লাশ দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। আশপাশে কয়েকটি লোক মলত্যাগ করিতেছিল; তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া দেখে গমিরের লাশ। থানায় এজাহার গেল, প্রমাণাভাবে পুলিশ কিছুই করিতে পারিল না।

মৌলবী সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ সাহেবের নিকট হইতে পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, স্বপ্নে দেখা পিতার হত্যা পুত্রের হত্যা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। হাদিসে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

গমির লোকটি ভালই ছিল, সঙ্গ দোষে তাহার পরিণাম এই হইয়াছিল। যে বুড়ো গমিরকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়াছিল তার জীবনও পারিবারিক কলহের সময়ে তাহার এক ভাতিজার লাঠির এক আঘাতে অবসান হইয়াছিল।

২য় স্বপ্ন—ম্যাপে যেমন দেখা যায়, সমস্ত ভারতবর্ষ যেন আমার চোখের সামনে (তখন পাকিস্তান জন্মলাভ করে নাই)। ভারতের উত্তর পশ্চিমে এক স্থানে আকাশ হইতে আলো এরূপ ভাবে পড়িতেছে যেন তার অপরদিক শক্ত এবং নিচের দিকটা ক্রমাগত

চৌড়া, যেমন গ্রামোফোনের ফ্যানেল হয়; সেই আলোক নিচের দিকে যেন ছড়াইয়া যাইতেছে এবং দেখিতে দেখিতে তার এক ঢেউ যেন বাংলা দেশে আসিয়া গেল এবং এরূপ বোধ হইল যেন ক্রমে সমস্ত দুনিয়া সেই আলোকে আলোকিত হইল। এই স্বপ্ন এত জ্বাজ্জল্যমান ছিল যে, আজও যেন সেই দৃশ্য আমার চক্ষের সামনে ভাসিতেছে।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, সে আলোক আলীগড় পড়িয়াছিল। পরে বুঝিতে পারিয়াছি সে আলোকের অবতরণ স্থান কাদিয়ান শরিফ। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম বাস্তবক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

৩য় স্বপ্ন—দেখিলাম আমি যেন আমার কোনো এক বন্ধুর সঙ্গে পদব্রজে ভারতের উত্তর পশ্চিমে যাইতেছি। বেহার, উত্তর প্রদেশ, পার হইয়া আরোও পশ্চিমে অগ্রসর হইলাম। সমস্ত রাস্তার দুই ধারে স্তুপীকৃত মানুষের হাড়, তার মধ্য দিয়া রাস্তা। পাঞ্জাবের নিকটে গিয়া একটা নদী পার হইতে হইল, কিন্তু বাধা পড়েছিল, তবে শেষটা সে বাধা দূর হইল, আমরা চলিয়া গেলাম এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। আমার যে বন্ধু সঙ্গে ছিল, সে গৌরবর্ণ এবং আমার মতই প্রায় পাতলা-পূতলা চেহারা।

রাস্তার দুই ধারের মানুষের হাড়ের স্তুপ, ইহা আজিও আমার নিকট পরিষ্কার হয় নাই। ইহার আত্মিক ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, রুহানিয়তের দিক দিয়া সব মৃত। অথবা বাহ্যিক হত্যাকাণ্ডের দিকেও ইঙ্গিত হইতে পারে। যেমন হিন্দুস্থান (India) হইতে পাকিস্তান পৃথক রাজ্যে পরিণত হওয়ার সময়ে হইয়াছিল।

আমার বন্ধুর গৌরবর্ণ ও পাতলা চেহারা—ঘটনাক্রমে আমার কাদিয়ান ভ্রমণের (১৯০৯) ১ম সঙ্গী ছিলেন—উকিলউদ্দিন খন্দকার, [বাগেরহাটের (খুলনা) উকিল] তখন তিনি এলাহাবাদের ছাত্র। ২য় বার সঙ্গে ছিলেন আতাউর রহমান এম, এ, (১৯১০)। তখন তিনি রাজশাহী কলেজের ইংরেজীর লেক্‌চারার ছিলেন। এখন তিনি খান বাহাদুর আতাউর রহমান শিলং, আসামের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষাবিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর। ১৯১৪ সনে আমার সহিত কাদিয়ান গিয়াছিলেন মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী এম, এ, তখন তিনি ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের (Asstt.) সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। বরিশালে তাঁর অপিস ছিল। ইহারা তিন জনই গৌরবর্ণ এবং সে সময়ে ক্ষীণাঙ্গ ছিলেন। আতাউর রহমান সাহেব পরে কিছু মোটা হইয়াছেন।

ল লেকচার শেষ করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার মাষ্টারী চাকুরী ছাড়িয়া যখন বগুড়ায় বসিয়াছিলাম; তখন খুব পেটের ব্যারামে (dispepsia) ভুগিতেছিলাম। এই অসুখ ২।৩ বৎসর পূর্ব হইতেই ছিল। নানারকম চিকিৎসা করিয়াও কোনও স্থায়ী ফল পাই নাই। বাপজান তখন এক পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তিনি এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগটা কি রকম বলিয়া বোধ হয়?" আমি বলিলাম, "চেহারা তো দেখিতেছেন, অনেক চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু কোনও ফল হইল না। এখন কোনও রুহানী চিকিৎসায় যদি কোনও ফল হয়।" তিনি বলিলেন, "কোনো পীরের প্রতি তোমার ভক্তি আছে?" আমি বলিলাম, "যে সব পীর জানা আছে তাহাদের কাহারও উপর আমার ভক্তি নাই।" তখন তিনি আমাকে একটা ওজিফা শিখাইলেন। সে "ওজিফা"টি এই—কিছু দিন প্রত্যহ ফজর ও মগরেবের নামাজের পর ছুরা ফাতেহা ও ছুরা এখলাছ পড়িতে হইবে। কতবার পড়িতে বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই, তবে খুব বেশীবার নয়, যতদূর আমার মনে পড়ে, ২০

বারের বেশী নয়ই। ঐ ছুরাগুলি তেলাওতের পর চক্ষু মুদিয়া কিছুক্ষণ মছল্লার উপরেই বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকাতে দুই এক দিন পরেই দেখিতে লাগিলাম পাগড়ী মাথায় এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে। এক কামরায় তিনি বসিয়া আছেন আর তার আশেপাশে কিছু আরো লোক আছে, মনে হইল তাহারা তাঁহার ভক্ত। তাহাদের মধ্যে কাহারও চেহারা বেশ সুন্দর, রং ফর্সা। সেই বুজর্গ প্রথমে দূরে ছিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল আমি যেন তাঁহার নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম। ক্রমে এমন হইল যে, খুবই নিকটবর্তী হইলাম, এমন কি আমি যেন তাঁহার শরীরের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গেলাম। প্রত্যহ এইরূপ দেখিতাম। প্রায় এক সপ্তাহ পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখিতে পাও?" আমি যাহা দেখিতে পাইতাম তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ চেহারার কোনও লোককে দেখিয়াছ?" আমি উত্তর দিলাম "না"। তিনি বলিলেন, "ঐ চেহারাটী মনে রাখিও, যখন ঐ চেহারার কোনও বুজর্গকে দেখিবে, তাঁহার হাতে বয়েত করিবে।"

আহ্‌মদীয়া জমাতে বয়াৎ গ্রহণ

যতদূর মনে হয় ১৯০৮ সনের বর্ষার প্রারম্ভে সেটেল্‌মেণ্টের বৎসরের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসে। সেই সময় আমি ঐ চাকুরী ইস্তাফা দিয়া বগুড়ায় আসিয়া B.L.-এর প্রথম পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ওকালতী আমার মনোনীত ব্যবসায় নয়; এই জন্য আইন পড়ার দিকে খুব ঝুকিয়া পড়িতে পারিলাম না। স্বাস্থ্যটাও ভাল ছিল না; সেই জন্য মনে শান্তি ছিল না। মার্চ বা এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতায় গেলাম। পরীক্ষায় ভাল করিতে পারিলাম না। পরীক্ষার পর কলিকাতায় উকিলউদ্দিন খন্দকার সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল এবং দিনগুলি প্রায় তার সঙ্গেই কাটাইতে লাগিলাম। তখন তিনি ২৪ পরগণার স্কুল সাব ইনস্পেক্টর। হেড্‌ কোয়ার্টার বোধ হয় কলিকাতাই ছিল। দুই জনেরই মতে শিক্ষকতা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ, ইহাতে দেশের ছেলেদিগকে আদর্শ মানুষ হইবার জন্য গড়িয়া তোলা যায়। সরকারী চাকুরীতে অসুবিধা, বেশী সরকারী নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হয়, ইহা ছাড়া বদলি আছে, একস্থানে থাকিয়া একটা পরিকল্পনা করিয়া তদনুযায়ী কাজ করা যায় না। উকিলউদ্দিন প্রস্তাব করিল, "তুমি কলিকাতার M. L Jubilee স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার হও, আমি ঐ স্কুলের মাষ্টারী লইব।" আমি স্বীকৃত হইলাম। উকিলউদ্দিন গিয়া চৌধুরী মহম্মদ লায়েক সাহেবের নিকট প্রস্তাব করাতে বৃদ্ধ চৌধুরী সাহেব (তিনি খন্দকারকে খুবই ভালবাসিতেন) তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। তখন স্কুল গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ ছিল, স্থির হইল বন্ধের পরেই আমরা কাজে যোগদান করিব। আদর্শের কাছে আপন আর্থিক সমস্যার প্রশ্ন আমরা কোনও দিনও তুলি নাই। উকিল উদ্দিন সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিল। আমরা দুইজন দম্‌দম্‌ ষ্টেশনের নিকট একটি একতালা ছোট বাড়ী ভাড়া লইলাম। একটি চাকরানী রাখা হইল। সেই বাড়ীতে একটু যায়গা ছিল, সেখানে বাগান করার জন্য কোদাল নিড়ানী ইত্যাদি খরিদ করিলাম। খাওয়া-দাওয়া বেশীর ভাগ নিরামিশ হইত; কখনও কখনও মাছ খাইতাম। জুবিলী স্কুল খুলিল। আমরা কাজে হাজির হইতে গেলাম। লায়েক সাহেবের বড় ছেলে স্কুলের সেক্রেটারী। তিনি আমাদিগকে আমল দিলেন না। লায়েক সাহেবকে বলা হইল। তিনি বলিলেন,

"কি করিব, আমি নিরুপায়।" তখন আমরা ঐ প্ল্যান ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। বগুড়া সোনাতলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টারী আমি বেশ পছন্দ করিতাম, খন্দকারও আসিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আমি জানিতাম প্রাইভেট স্কুলের হেড্‌ মাষ্টারী করায় চাচার সম্পূর্ণ অমত ছিল। তিনি দিন রাত হাহুতাশ করিতেন, নিকটে থাকিয়া শুনা আমার পক্ষে মুস্কিল ছিল। ইতিমধ্যে মোঃ কমরউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেবকে (তখন তিনি সাব-ডেপুটী মাত্র) এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁর বড় ভাই মোঃ মহিউদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, সুতরাং সে পাটনা কলেজে পড়িবে। মহিউদ্দিন সাহেবের অন্য ছোট ছেলেদের জন্য একজন প্রাইভেট মাষ্টার দরকার। আমি গেলে আমাকে মাসে ৫০৲ টাকা দিতে পারেন। আমার পেটের অসুখ, বেহারের আব হাওয়া ভাল, ওখানে ২।১ বৎসর থাকিলে আমার স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। আমি খন্দকারকে বলিলাম, "আমি মোঃ মহিউদ্দিনের নিকট যাইতে চাই। আর তুমি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিলা, মাষ্টারীই যদি করিতে হয় তবে হেড্‌ মাষ্টার না হইলে অন্যের অধীন হইয়া নিজের প্ল্যান মত কাজ করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমার বি, এ, পাশ করা দরকার। তোমার ছোট ভাই নকিবউদ্দিনকে তুমি খরচ দিয়া মেডিক্যাল স্কুলে পড়াইয়াছ—সে পাশ করিয়া এখন বাড়ীতে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ীর ভার এখন সে নিবে। তাহাকে বল তোমার বি, এ, পড়ার জন্য সে যেন মাসে ২০।২৫ দেয়। তুমি আলীগড় কলেজে গিয়া বি, এ, পড়। উকিলউদ্দিন ইহাতে রাজী হইল। আমরা দমদমার গৃহস্থি গুটাইয়া এক সঙ্গে পশ্চিমদিকে যাইবার জন্য রওনা হইলাম। কলিকাতা হইতে বেহারের কিউল ষ্টেশন পর্য্যন্ত একসঙ্গে গিয়া আমি গয়া জেলার নওয়াদা যাওয়ার জন্য নামিয়া পড়িলাম। উকিলউদ্দিন সোজা আলিগড়ে গেল। নওয়াদায় পৌছিয়া ষ্টেশন হইতে একটি কুলির মাথায় আমার বাক্স বিছানা দিয়া (সাবডিবিসন্যাল অফিসার) মহকুমা হাকিম মহিউদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসায় গেলাম। বাংলোর বারান্দায় কুলিকে রাখিয়া আমি ডেপুটী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে কামরার ভিতরে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া অল্প দু'চার কথা বলিয়া ২।৩ মিনিট পরে কুলিকে বিদায় করার জন্য বারান্দায় আসিয়া দেখি কুলি নাই। চাপরাসিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুলি কোথায়?" সে বলিল, "উয়া তো চালা গিয়া হ্যায়।" আমি বলিলাম, 'পয়ছা তো মাঁইনে আভি তক নাঁহি দিয়া।" উত্তর দিল, "এস, ডি, ও, ছাহেবকে এহাঁ আকে পয়ছা লেগাহ্‌? আমি বুঝিলাম বেহারে বেগার প্রথা এখনও আছে। ডেপুটী সাহেব দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হইলেও আমার সঙ্গে আত্মীয়ের মতই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহাকে কমরউদ্দিন সাহেবের চিঠির কথা বলায় তিনি বলিলেন, "বড় ছেলে তো নাই, তাহাকে পড়াইতে হইবে না। ছোট (দুটি বা তিনটি) ছেলেদের জন্য মাসে ৩০৲ দিতে পারি। আপনি আমার নিজের লোকের মত থাকিবেন। আমি যখন মফঃস্বলে যাইব তখন আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। ইহাতে আপনার একঘেঁয়ে ভাব (Monotony) দূর হইবে। এর মধ্যে তাঁহার জামাই আমার বাল্যবন্ধু তবিবর রহমান তথায় আসিল। সে কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া ফিরিয়া গেল। সেখানে নিজকে যেন বড় একা একা বোধ করিতে লাগিলাম। কোনও সঙ্গী নাই, মন খুলিয়া আলাপ করার লোক নাই। মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য অনেকখানি। তিনি অবশ্য আমার মন যোগাইবার চেষ্টা করিতেন, সন্ধ্যার সময়ে (তখন গরমের সময়, মে-জুন এই রকম হবে) বাহিরে বসিয়া বেশ আলাপ-আলোচনা হইত। তাঁহারও অন্য সঙ্গী ছিল না। তবুও যেন আমার ভাল লাগিতেছিল না। উকিলউদ্দিনের চিঠি পাইলাম, আলীগড় কলেজ

তাহার ভাল লাগে নাই। হোষ্টেলে ছাত্রগণের মধ্যে ফ্যাসানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দিনরাত কেবল হাসি ঠাট্টা, কেমন একটা হাল্কাভাব, **Seriousness** (গাম্ভীর্য)-এর একান্ত অভাব, এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় সে এলাহাবাদে আসিয়া তথাকার খৃষ্টিয়ান কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, হোষ্টেলে থাকে। সন্ধ্যার সময়ে ডেপুটি সাহেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইত। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মির্জা গোলাম আহমদ সম্বন্ধে আপনার কি মত ?' তিনি বলিলেন, "মির্জা সাহেব একজন মহত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইসলামের খুব বড় খেদমত করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে ইসলাম জগত এমন এক ব্যক্তিকে হারাইয়াছে যাহার স্থান পূর্ণ করিতে পারে এমন লোক দেখা যায় না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁহার দাবী সম্বন্ধে আপনার কি মত ?" তিনি বলিলেন, **That's all bosh** অর্থাৎ 'ওসব কিছু না। হযরত মির্জা সাহেবের লেখা আমি যতটুকু পড়িয়াছি তার মধ্যে একটা আন্তরিকতা (**Sincerity**) আমি লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ শুধু মুখের কথা কান পর্যন্তই পৌছে ; হৃদয় স্পর্শ করে না। হৃদয় হইতে যে কথা বাহির হয় তাহা হৃদয় স্পর্শ করে। মির্জা সাহেব একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, একথা বেশ বুঝা যায়।" কিন্তু মহত্তের সঙ্গে ভণ্ডামীর যোগ হইতে পারে কিনা ইহাই হইল এখন প্রশ্ন। মির্জা সাহেবের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল কিনা, তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য আমার মনটা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কয়েকদিন পর আমি ডেপুটী সাহেবকে বলিলাম, "আমার শরীর ভাল লাগিতেছে না, আমি দিল্লীতে গিয়া হেকিমি চিকিৎসা করিতে চাই।" যেদিন যাওয়া ঠিক করিলাম, সেদিন ডেপুটী সাহেবের বিবি বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ না কাল যাইবেন।" সুতরাং সেদিন থাকিয়া গেলাম। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে জানিতে পারিলাম, বিবি সাহেবা খাওয়ার জন্য সঙ্গে কিছু দিতে চান, এই জন্যই সেদিন থাকিতে বাললেন। ইহাতে বুঝিলাম, আমার প্রতি তাঁর একটু স্নেহ জন্মিয়াছে। যাহা হউক পরদিন রওনা হইয়া এলাহাবাদে গেলাম। উকিল উদ্দিনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল একটা জায়গীর লইয়া এখানে থাকিয়া যাও। আমিও প্রথমতঃ তাহাই করিব মনে করিলাম। কিন্তু ২।১ দিন পর একেবারে কাদিয়ান যাওয়াই স্থির করিলাম। কাদিয়ান যাওয়ার আমার দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ—১ম আধ্যাত্মিক বিষয়, হযরত মির্জা গোলাম আহ্মদ সাহেব সম্বন্ধে, তাঁর চরিত্র, তাঁর লক্ষ্য, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ২য় হযরত মৌঃ নূরউদ্দিন যিনি জমাতের খলিফা ও একজন বিখ্যাত আলেম হওয়া ছাড়াও একজন প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। যদি সম্ভব হয় তাঁর দ্বারা চিকিৎসা করান। এক কথায় আত্মিক ও শারীরিক চিকিৎসা করান। ইলিয়ট হাষ্টেলে থাকা কালিন যখন আমি ৪র্থ বার্ষিক বি,এ,র ছাত্র (১৯০৪) তখন আসাম ডিব্রুগড়বাসী আতাউর রহমান তথায় আসিয়া ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। দেখিলাম ইনি একজন **Public spirited youngman** (সমাজ সেবায় উৎসাহী যুবক)। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে বেশ একটু ভাব হইয়া গেল। মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীকে মৌলবীদের মধ্যে আমরা উচ্চস্থান দিতাম। মৌলানা সাহেব একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। ব্যাঙ্কের সুদকে তিনি জায়েজ বলিতেন। তাঁহাকে লইয়া আমরা খাদেমুল ইসলাম সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলাম। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌঃ ইসলামবাদী, সেক্রেটারী ছিলাম আমি ও সহকারী ছিলেন আতাউর রহমান। বরিসালের দুর্ভিক্ষের জন্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবে, রাস্তায় রাস্তায় এবং ট্রামের যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রায় ৬০০।৭০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া-

ছিলাম। বড় বড় Public মিটিং-এর বন্দোবস্ত করিতাম আমাদের এক মিটিং-এ বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন The Bengali দৈনিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক এবং রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কোনও একটি বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম আতাউর রহমান আহ্‌মদী। আঃ রহমানকে একদিন নিরিবিলি ভাবে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, সে আহ্‌মদী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি সত্যিই মির্জা সাহেবকে এমাম মাহ্‌দী বলিয়া বিশ্বাস কর? সে বলিল "হাঁ, আমার পিতা পেশোয়ার নিবাসী। আসামে ঠিকাদার ছিলেন, পরে তিনি ডিব্রুগড়ে বিবাহ করিয়া তথায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন। তিনি পুরানা আহ্‌মদী। আমি তাঁর ছেলে বলিয়া আহমদী নই, এফ, এ, ক্লাশ পর্যন্ত আমি ঐ মতে বিশ্বাসী ছিলাম না। পিতার মাতৃভাষা উর্দু; আমি উর্দু তার নিকট শিখিয়াছি। পিতার আহ্‌মদী সংক্রান্ত পুস্তকাদি আমি এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া কয়েক মাস পড়িয়া তারপর পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমি এ মত গ্রহণ করিয়াছি।" তখন ভারত গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারিয়েট শীতের সময়ে শিমলা হইতে কলিকাতায় (ভারতের রাজধানী) আসিত। সেক্রেটারিয়েটের আমলাদের মধ্যে কয়েকজন আহ্‌মদী ছিল। আতাউর রহমান একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দেয়। তাঁর চেহারা, হাবভাব, কথাবার্তা, নমাজ পড়া ইত্যাদি আমার মনে বেশ একটা ছাপ কাটিয়াদিল। আবদুর রহমানের সহিত গিয়া আহ্‌মদী জমাতের সঙ্গে ইদের নামাজও একবার ইডেন গার্ডেনে পড়িয়াছিলাম। সেখানে খোৎবা উর্দুতে হইয়াছিল, আরবীতে নয়, যেমন আর সর্বত্র আরবীতেই হয়। কাদিয়ানে যাওয়ার রাস্তা আতাউর রহমানই বাৎলাইয়াছিল। এলাহাবাদে আমার ট্রাঙ্ক-বাক্স রাখিয়া শুধু সামান্য বিছানা বালিশ লইয়া রওনা হইয়া সোজা লাহোর গিয়া খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে উঠিলাম। খাজা সাহেব তখন (১৯০৯) লাহোর চিফ্‌কোর্টের উকিল। সকালে পৌঁছিলাম, গিয়া দেখি খাজা সাহেব মক্কেল বেষ্টিত হইয়া কাজ করিতেছেন। মানুষটি বেশ মোটা, চক্ষু দুটি কালো, বড় নয়, গভীর। আমি পরিচয় দিয়া বলিলাম, "কাদিয়ান যাইতে চাই, কিন্তু কাদিয়ানের রাস্তা জানা নাই; তাই এক বন্ধুর উপদেশ আপনার নিকট আসিলাম, যেন আপনার কাছে রাস্তার সন্ধান পাই।" তিনি বলিলেন "আমি এখন কাজে ব্যস্ত আছি। আপনি আজ এখানে থাকুন, সন্ধ্যার সময়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হইবে। কাল সকালে আপনি কাদিয়ান রওনা হইবেন।" আমি থাকিয়া গেলাম। তখন জুন মাস, অত্যন্ত গরম, সন্ধ্যার একটু আগে খাজা সাহেব কাচারি হইতে আসিয়া গোছল করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা দুই জন এক সঙ্গে খাইতে বসিলাম। চাকরটি এক একটি রুটি সেঁকিয়া দস্তরখানের উপর রাখিয়া যাইতে লাগিল। আমরা একি পেয়ালা হইতে ছালুন লইয়া খাইতে লাগিলাম। খাওয়া শেষ হইলে খাজা সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একজন গ্র্যাজুয়েট; বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি কাদিয়ান যাইতে চান?" আমি বলিলাম, "আমি মুসলমানের ঘরে জন্মিলেও মৌলবীগণ ইসলামের যে ব্যাখ্যা দেয় তাহাতে ইসলামের প্রতি আমার ভক্তি নাই। আমি চাই খোদাকে। এজন্য আমি ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টিয়ান ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম অনুসন্ধান করেছি। বাইবেলে পড়েছি, যিশু বলেছেন "**Blessed are the pure in spirit for they shall see God**" (যাদের অন্তঃকরণ নির্মল তাহারা ধন্য, তাহারা আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাইবে)। একজন হিন্দু সাধক রাম কৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেন, "ভগবানকে এই পৃথিবীতে

এবং এই জীবনেই লাভ করা যায়।" খৃষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদ এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিমা পূজা আমি গ্রহণ করিতে পারি না। মির্জা সাহেব বলেন, "খোদাকে এই দুনিয়ায়, এই জীবনে লাভ করা যায়। যদিও তিনি এখন নাই, তবে ফল দেখিয়া গাছ চেনা যায়, মির্জা সাহেবের শিষ্যগণকে দেখিলে তাঁহার শিক্ষার মর্ম কিছু বুঝিতে পারিব। এই উদ্দেশ্যেই আমি কাদিয়ান যাইতে চাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, "আমিও ঠিক ঐ মনোভাব লইয়া কাদিয়ান গিয়াছিলাম। আমি লাহোরে এক ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়িতাম। ধর্ম বিষয়েও আলোচনা করিতাম। মৌলবীদের প্রচারিত ইসলামে অভক্তি হওয়াতে আমি ক্রিশ্চিয়ান হওয়াই এক রকম স্থির করিয়াছিলাম। আমার পিতা দেখিলেন, এ-একগুঁয়ে ছেলে; জোর করিয়া বাধা দিলে থামিবে না। তিনি মনে করিলেন যে, এ যদি মির্জা সাহেবকে গ্রহণ করে, তবুও তো ইসলামের ভিতরেই থাকিবে, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান হইলে রছুলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) মিথ্যা নবী মনে করিবে। এই মনে করিয়া তিনি আমাকে কাদিয়ানে নিজেই লইয়া গেলেন,—যদিও তিনি আহ্‌মদী ছিলেন না। হযরত মির্জা সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁহার সঙ্গে ২।৪টা কথাবার্তার পর বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি মারফতের (তত্বজ্ঞানের) একটি দরিয়া। আমার সকল সন্দেহ দূর হইল; আমি সাগ্রহে তাঁহার হাতে বয়েৎ করিলাম। তারপর আমি এত খুশী হইলাম, এত খুসি হইলাম যে, আমি খুশিতে ফুলিতে লাগিলাম। তৎপূর্বে আমি আপনার মতই দুবলা পাতলা ছিলাম, দেখুন (নিজের বপু দেখাইয়া) আমি এখন কত মোটা হইয়াছি। কাদিয়ান যাওয়ার পথ বলিয়া দিয়া আমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন, বলিলেন, "কাদিয়ান একটি রুহানি হাসপাতাল, সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন আবার রোগীও আছে। কোনও আহ্‌মদীর মধ্যে দুর্বলতা দেখিলে ঘাবড়াইবেন না।" পর দিন সকালে তিনি আমার হাতে দুইখানা চিঠি দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। একখানা চিঠি ছিল মৌলবী মুহম্মদ আলীর নামে অপর খানা হযরত মোঃ নূরউদ্দিন সাহেব খলিফাতুল্ মছিহ্ আউয়াল রাঃ)-এর নামে। আমি প্রাতে লাহোর হইতে রওনা হইয়া অমৃতসর ষ্টেশনে ট্রেন বদলাইয়া অমৃতসর পাঠানকোট শাখা লাইনের বাটালা ষ্টেশনে নামিলাম। তথা হইতে কাদিয়ান প্রায় ১১ মাইল। অন্য দুই ব্যক্তির সহিত এক্কা গাড়ীতে চড়িয়া কাদিয়ানে পৌঁছিলাম। অপর দুটি লোক নামিয়া গেল, তাহারা সম্ভবতঃ আহ্‌মদী ছিল। এক্কা হইতে নামার স্থান হইতে কোনদিকে কোথায় যাইতে হইবে আমি জানিতাম না। যে রাস্তা সহরের ভিতরে গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইব, এমন সময়ে একটি যুবক (তাহার চুল হইতে আপাদ মস্তক সব সাদা) আসিয়া আমাকে পাঞ্জাবী ভাষায় তার স্বাভাবিক ভারী আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঙ্গাল হইতে তুমি আসিয়াছ?" আমি বলিলাম "হাঁ"। "দিজিয়ে" বলিয়া সে আমার বিছানার বাণ্ডিলটি লইয়া ইঙ্গিত করিল "আসুন"। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বড় মসজিদের প্রাঙ্গনে পৌঁছিয়া দেখি, (তখন আছরের ওয়াক্ত,) পাগড়ি একটু এলোমেলো ভাবে মাথায় বান্ধা, কুর্তা ও ছেলোয়ার পরা, দাড়িতে লাল খেজাব লাগানো এক বৃদ্ধ প্রাঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছোট একটা গাছের নিচে তাঁর সম্মুখে চারি কোণা সারি বান্ধিয়া (যেমন জমিনের উচু আইল দেওয়া হয়) বালক বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক নানা বয়সের লোক কোরআন হাতে বসিয়া আছে। আমি বৃদ্ধকে দেখিয়া বুঝিলাম, ইনি খলিফা সাহেব। তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া আমি সেলাম করিয়া পায়ে হাত দিতে যাইতেছিলাম; তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "পা ছোয়া ইসলামী কায়দা নয়, ইসলামী নিয়ম

মোসাফা করা। এই বলিয়া তিনি মোসাফা করিলেন এবং আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি বসিয়াই দুইখানা চিঠি তাঁহার হাতে দিলাম। তাঁহার নিজের চিঠি তিনি পড়িয়া অপর চিঠিখানা সেই শ্বেতকায় যুবককে দিয়া বলিলেন, "মৌলবী মুহম্মদ কো দে আও।" তারপর তিনি দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফের খানিকটা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমি বসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে ছিলাম এবং মনে মনে একটু যেন অভক্তির সহিত ভাবিতেছিলাম এক মস্‌জেদের প্রাঙ্গনে এক মোল্লা কোরআনের দরছ দিতেছে এবং কতকগুলি (১৫০।২০০ প্রায়) তালেবে এল্‌ম শুনিতেছে—মোল্লার বা শিষ্যদের কাহারও ভদ্র বেশ নাই, মামুলি গরিব তালেমে এলেমদের মতন, আমি কি ইহাই দেখিতে কাদিয়ানে আসিলাম? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে বৃদ্ধ তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গেই আমার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বাহিরটা দেখিয়া ভিতরের অবস্থা তদ্রূপ মনে করা ঠিক নহে।" আমার বোধ হইল যেন এই কথাটি আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। যাহা হউক দরছান্তে মেহমান-খানায় গেলাম। মেহমান-খানার প্রাঙ্গনে কতকগুলি খাটিয়া বিছানা-সহ ছিল। একটি আমাকে দেওয়া হইল। বেনারসের যুবক মাহবুব-রহমানকে আমার দেখাশুনার ভার দেওয়া হইল, কারণ সেখানে তিনি আমার নিকটতম পড়শি। সান্ধ্য আহার করিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। গরমের দিনে, বাহিরে, আকাশের নিচে শুইয়া বেশ লাগিতেছিল। মাহবুব সাহেব আমার গা দাবাইতে লাগিলেন, আমি একটু লজ্জিতভাবে নিষেধ করিলাম, তিনি দাবাইতে দাবাইতে বলিলেন, "আপ মেহ্‌মান হেঁ, থকে হুয়ে হেঁ, আপ্‌কী-খেদমত কর্না মেরে লিয়ে খুশী ভি হ্যায় আওর ছওয়াব ভি হ্যায়।" আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। এক ঘুমেই রাত্রি শেষ হইল; রাত্রি কোনদিক দিয়া গিয়াছে টের পাই নাই, ভোরে রৌদ্র পায়ে লাগিলে ঘুম ভাঙ্গিল। আমি মাহবুব সাহেবকে বলিলাম, "আমাকে নমাজের সময়ে ডাকেন নাই কেন?" তিনি বলিলেন, "আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন সেইজন্য ডাকি নাই। ক্লান্তি দূর না হইলে এবাদতও ঠিক হয় না। নাস্তা খাইয়া মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসরের মত বোধ হইল। ছোট্ট একটা কামরায় বসিয়া লিখিতেছিলেন। তখন তিনি **Review of Religions** এর (ইংরেজী ও উর্দ্দু উভয়ের) সম্পাদক, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার সেক্রেটারী, ইহা ছাড়া কোরআন মজিদের ইংরেজী তরজমাও করিতে-ছিলেন। খুব কর্ম্ম-ব্যস্ত ছিলেন এবং নিয়মিত জীবন যাপন করিতেন। প্রাথমিক আলাপের পর আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার ইস্লাম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন আছে, তন্মধ্যে একটি হইতেছে সুদ সম্বন্ধে। তিনি বলিলেন যে, সুদ খুব কম হারে লওয়া বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সুদ খাওয়া একবার আরম্ভ করিলে মাত্রা ঠিক রাখা যায় না; যেমন মদ—যে খাইতে আরম্ভ করে অধিকাংশ স্থলেই সে মাত্রা ক্রমেই বাড়াইতে থাকে। মদের দোষও আছে—গুণও আছে, কিন্তু গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই বেশী, এইজন্য মদ হারাম হইয়াছে। সুদও অনেকটা সেই রকম। ইস্লামের নীতি হইতেছে, যে জিনিসের ফল মোটের উপর খারাপ তাহা গোড়া হইতেই নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, "সুদ হারাম গরীবের প্রতি অন্যায় হয় বলিয়া; কিন্তু যেখানে উত্তমার্ণ সব অমুসলমান এবং অধমর্ণ সব মুসলমান, যেমন বাংলা দেশে আছে, সেখানকার সমস্যা অন্য রকম। বাংলা দেশে তখন মহাজনদের নিকট কর্জ্জ লইলে সুদের হার ছিল সাধারণতঃ টাকা প্রতি মাসিক ৴০ কচিৎ ৲১০ তার কম ছিল না। ফলে মুসলমান গরীবগণের সুদের হার বেশী, মুসলমানগণ সুদে কর্জ্জ দিলে সুদের

হার কম হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন বাংলার হিন্দুগণ মোটের উপর ২০ কোটি টাকার লগ্নি করে, ইহাতে সুদের যে হার আছে, যদি মুসলমান অবস্থাপন্ন লোকেরা (তাহাদের সংখ্যা খুব কম হইলেও কিছু আছে) ১০ কোটি টাকারও লগ্নি করিত তবে ২০৲ কোটি টাকার মূলধনে যে সুদের হার হয়, ৩০৲ কোটি টাকার মূলধনে তার চেয়ে সুদের হার নিশ্চয় বেশ কম হইত। মুসলমানরা সুদ না খাওয়াতে তাহাদের ধনীদেরও ধন বাড়িতেছে না, গরীবের সামান্য ধন হিন্দুদের হাতে বেশী হারে যাইতেছে। এইভাবে এক সমাজ অপর সমাজকে লুটিয়া খাইতেছে। এবং গরীবের সর্ব্বনাশ বেশীভাবে হইতেছে। মৌলবী সাহেব আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি খলিফা সাহেবের নিকট এ সমস্যাটি পেশ করুন।"

আমি হযরত খলিফা সাহেব (রাঃ)-এর দরবারে যাইয়া দেখি তিনি মৌলবী কুতুবদ্দিনের মাঝারি ধরণের একটা কামরায় দক্ষিণ পূর্ব কোনে মেজেতে বসিয়া আছেন। আমাকে পার্শে বসিতে বলিলেন। আমি সুদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, সুদ দুটি প্রধান কারণে অবৈধ (১) নৈতিক—সুদ-খোরেরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ও কৃপণ হয় এবং আল্লার ওয়াস্তে বা সমাজ-কল্যাণের জন্য লিল্লাহ্ দান-খয়রাত করিতে পারে না, প্রত্যেকটি পয়সা খরচ করিতে তাহারা হিসাব করে। একটি টাকা দান করিতে বলিলে তাহারা হিসাব করে, এক টাকার সুদ বৎসরে ৸০ পর্যন্ত হইতে পারে। আমার ১৸০ সুদ আসলে ২য় বৎসরে প্রায় ৩৲ টাকা হয়; ৩য় বৎসরে ৫৲ টাকারও অধিক হয়। কাজেই ১৲ দেওয়ার অর্থ ভবিষ্যতের বহু টাকার লাভ ছাড়িয়া দেওয়া। কিন্তু ইস্লামের নীতি হইতেছে আল্লাহ্‌র কাজে আবশ্যক হইলে শুধু ধনমাল নহে জান-প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবে। ২য় কারণ-আর্থিক—ঐ সমাজ ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল যাহাতে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য কমিয়া আসে এবং ধনী দরিদ্রকে সক্রিয় সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ইসলামের আর্থিক বিধি ব্যবস্থা গুলিতে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সুদের ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক পার্থক্য ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। অগণিত পরিবার এমন কি অনেক রাজ্যও সুদের কারণে নষ্ট হইয়াছে। তিনি মিশরের (Egypt) দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, মিশরের খেদিব, মহাম্মদ আলী পাশা ইংরেজের নিকট সুদে বহু টাকা কর্জ্জ করাতেই ক্রমে ক্রমে মিশরের আসল শাসন ক্ষমতা ইংরেজের হাতে আসিয়া গিয়াছে। হযরত খলিফা সাহেবের যুক্তিগুলি আমার কাছে ভাল লাগিল, কাজেই আমি আর তর্ক করিলাম না।

আমি সে সময় উর্দু ভাল জানিতাম না। হযরতের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতেই কথা বলিতাম, কারণ তিনি ইংরাজী জানিতেন না। মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে উর্দু অপেক্ষা ইংরাজীতেই কথা বার্তা বেশী বলিতাম। উর্দু ভাল জানিতাম না বলিয়া ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের সঙ্গেই মেলামেশা বেশী করিতাম।

যতদুর আমার মনে হয় সুদ সম্বন্ধে হযরত খলিফা সাহেব সম্ভবতঃ আরও দুটি কথা বলিয়াছিলেন। (১) সুদ খাওয়া যেমন নিষেধ, সুদ দেওয়াও তেমনি নিষেধ। টাকার অভাব হইলে যেখানে বিনাসুদে কর্জ পাওয়া যায় না, সেখানে সম্পত্তি কিছুটা বরং বিক্রয় করাও ভাল; কারণ সুদের ফলে সম্পত্তি অনেক সস্তায় মহাজনদের হাতে যায়। (২) কুসিদজীবিরা এত সহজে প্রচুর লাভ করে যে, তাহারা ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেয় না। একটা জাতির এক শ্রেণীর লোক যদি অপর শ্রেণীর লোককে লুটিয়া খায় সে জাতি উন্নতি করিতে পারে না। জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে উৎপন্ন এবং দেশ বিদেশে ব্যবসায়ের উপর।

এর পর প্রায় দিনই হযরত খলিফা সাহেবকে পাইতাম তাঁর বাড়ী সংলগ্ন পশ্চিম দিকের রাস্তার ধারে একটি কামরায়, যাহাকে 'মৌলবী কুতুবুদ্দিন ওয়ালা কামরা" বলিত। মেজেতে তাল বা খেজুর পাতার চাটাই বিছানো থাকিত। কামরার দক্ষিণ পূর্বকোণে মেজেতে বিছানো একটি কম্বলের উপর হযরত বসিতেন। অন্যান্য লোক চাটাইয়ের উপর বসিত। হযরত সাহেব ঐ খানে সকাল হইতে ১২টা ১টা পর্যন্ত বসিয়া সমাগত রোগীদের চিকিৎসা করিতেন এবং আগন্তুক লোকদের সঙ্গে দেখা করিতেন। দরজা খোলা থাকিত; লোক ইচ্ছামত যাওয়া আসা করিতে পারিত। হযরতের পোষাক, কথাবার্তা এবং ব্যবহার এত সাদাসিদা ছিল যে, তাঁহার নিকট আমার কোনো সংকোচ বোধ হইত না। আমি তাঁহাকে ২য় প্রশ্ন করিয়াছিলাম,—আমাদের জন্য বর্তমান সময়ে, (১৯০৯ ইং) যখন আমরা ইংরেজের গোলাম হয়ে আছি, এমতাবস্থায় ধর্মই বেশী জরুরী না রাজনীতিই অধিক জরুরী। ধর্ম মানে সাধারণতঃ লোকে এই বুঝে, নামাজ পড়, রোজা কর, হজ্ব কর, জাকাৎ দাও ইত্যাদি। আমরা নমাজ পড়ি, রোজা করি; কিন্তু যদি আমরা খ্রীষ্টিয়ানদের গোলাম হইয়া থাকি, তবে সে ধর্ম কর্মের সার্থকতা কি? এ জন্য আমাদের কি এখন স্বাধীনতাই অধিক কাম্য নয়? একটা গোলামের জাতির আবার ধর্ম কি? এজন্য তো ধর্মান্দোলনের চেয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন বেশী জরুরী বলিয়া বোধ হয়।

হযরতের উত্তর—মুসলিম জাতি কি স্বাধীন এবং উন্নত ছিল না? এখনও তো কতকগুলি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য আছে; কিন্তু সেগুলি কত দুর্বল, কত অধোপতিত! হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন, 'আমি উম্মতের জন্য দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, একটি আল্লার কালাম কোরান মজিদ, অপরটি আমার সুন্নৎ অর্থাৎ আমার আচরণ। আল্লাহ্-তালার কোরআনের আদেশ কি ভাবে কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহা আমি আমার আচরণ দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছি, যত দিন মুসলিম কোরআন এবং সুন্নৎ অন্তরের সহিত প্রকৃতভাবে ধরিয়া থাকিবে ততদিন সে উন্নতির পথেই যাইবে; কিন্তু যখনই সে এই দুইটি ছাড়িবে অর্থাৎ তাহার ধর্ম কর্ম কেবল বাহ্যিক জিনিস হইবে অন্তরের জিনিস হইবে না তখন সে রাজ্য, শক্তি, ধন, জ্ঞান সব হারাইবে। ইতিহাস হযরত রছুলে করীমের কথার সত্যতা প্রমান করিয়াছে। জাতীয় উন্নতির মূল হইতেছে চরিত্র। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। চরিত্রের মূল হইতেছে আল্লাহ্তালার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস। ব্যক্তির এবং জাতির উন্নতির মুল, চরিত্র। যে জাতির মধ্যে চরিত্র বল আছে, সে জাতি সহজেই সর্বাঙ্গিন উন্নতি করিতে পারে, এমন জাতি চিরকাল পরাধীন থাকিতে পারে না। উন্নতির জন্য চরিত্রের দরকার, চরিত্রের জন্য আল্লাহ্তালার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস (একিন) দরকার। একিন শুধু বক্তৃতায় বা কেতাব পড়িয়া হয় না। নিজের জীবনে বা যাহাকে দেখি বা জানি তাহার জীবনে আল্লাহ্তালার নিদর্শন দেখিলে তখন একিন লাভ হয়। এজন্য ধর্ম চর্চা ও ধর্ম জীবন যাপন করা দরকার; এ প্রণালী অবশ্য সময় সাপেক্ষ; কিন্তু একটা জাতি হঠাৎ একদিনে উঠেও না, এবং হঠাৎ একদিনে পড়েও না। এই জন্য মুসলমানদিগকে প্রকৃত মুসলমান হইতে হইবে।

অপর পক্ষে যাহারা শুধু ক্ষমতা বা রাজ্য লাভ করার জন্য রাজনীতির পথ অবলম্বন করে তাহারা সাধারণতঃ ন্যায় অন্যায়ের বাছ বিচার করে না, তাহারা সাময়িক ভাবে কৃতকার্য হইলেও সে কৃতকার্যতা স্থায়ী হয় না।

হযরত সাহেবের উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও খুবই যুক্তিপূর্ণ, এবং ইতিহাস পাঠ করিয়া আমার ধারণাও অনুরূপ হইয়াছিল। কাজেই আমি স্বীকার করিয়া লইলাম।

হযরতের নিকট আমার তৃতীয় প্রশ্ন—নমাযে আরবী ভাষা এবং বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করাই বাধ্যতামূলক কেন? আমি নমাজ পড়িব অর্থাৎ আল্লাহ্‌তালার উপাসনা করিব, সেজন্য আরবীতে কথাগুলি বলিতেই হইবে কেন? আমার নিজের ভাষায় যদি নমাজের কথাগুলি বলি, দাঁড়াইয়া, বসিয়া, বা শুইয়া খোদাতালার নাম লই, তাঁহার প্রতি ভক্তি জানাই, তাহা তাঁহার নিকট কেন গৃহিত হইবে না? এক কথায় উপাসনার ভাষা ও বাহ্যিক শারিরীক অনুষ্ঠানের উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে কেন?

উত্তর ঃ—মানবজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, দুনিয়াতে দুইটি বিভিন্নমুখী শক্তি উপযুক্ত প্রয়োগের ফলে মানব সমাজের উন্নতির কারণ হইয়াছে এবং অপ-প্রয়োগ দোষে অবনতীর কারণ হইয়াছে। তাহার একটি হইতেছে নিয়মানুবর্তিতা, যাহা সংগঠনের, ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়—সামরিক নিয়মানুবর্তিতা ইহার একটি দৃষ্টান্ত, ইহা একটি প্রচণ্ড শক্তি। অপর শক্তি হইতেছে স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম যাহা ব্যক্তিত্বের ভিতর প্রকাশ পায়, ইহাও একটি বিরাট শক্তি, দুনিয়াতে নূতন নূতন চিন্তাধারা, নূতন নূতন আবিষ্কার ইহা দ্বারা হইয়াছে; মানব সভ্যতার উন্নতি—ইহার দ্বারা হইয়াছে।

ইস্‌লাম এই দুটি শক্তিরই যথাযথ প্রয়োগের বিধান করিয়াছে। উপাসনার মধ্যেও ইহা লইয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ দৈনিক পাঁচবার পড়া এবং আরবী ভাষাতে পড়া ও দৈহিকভাবে পড়া বাধ্যতামূলক। আবার পাঁচ অক্ত নমাজ ছাড়া মুস্লিম সমস্ত দিনরাত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌তালাকে স্মরণ করুক এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুক, ইস্লাম ইহাও শিক্ষা দেয়। ইহাতে ভাষা বিশেষ বা উঠাবসার কোনো সম্বন্ধ নাই। আনুষ্ঠানিক নমাজ হিন্দুদের যোগাসনের মত। আরবী ভাষা এবং বিশেষ নিয়মে উঠাবসার দ্বারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের একটা উপায় করা হইয়াছে। হযরত আমাকে বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালী মুসলমান, তুমি যদি কোন দেশে যাও তবে সেখানে মুসলমানকে তুমি কেমন করিয়া চিনিবে? তাহাদের পোষাক ও ভাষা ভিন্ন। নমাজে আরবী ভাষার ব্যবহার এবং বিশেষ পদ্ধতিতে নমাজ পড়া দেখিয়াই তুমি অন্যকে মুসলমান বলিয়া চিনিতে পারিবে।

অপরদিকে দেখ; শিল্প, বিজ্ঞান, ইত্যাদিতে নূতন নূতন স্বাধীন চিন্তা ও ক্রিয়া দ্বারাই সকল উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। ধর্ম্ম-জগতেও ঠিক এই রকম।

এই কথাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অত্যন্ত গভীর। এ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায় ইহার সত্যতা ততই পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়।

একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এবং কিছুদিন পর উকিলউদ্দিন খন্দকার যখন কাদিয়ানে গিয়াছিল, সেও লক্ষ্য করিয়াছিল, কতবার মনে মনে স্থির করিয়াছি আজ হযরত সাহেবের নিকট অমুক বিষয়ে প্রশ্ন করিব, কিন্তু তাঁহার নিকটে গিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় নাই, হযরত নিজেই প্রশ্ন তুলিয়া উহার জবাব দিয়াছেন।

প্রথম প্রথম আমি হযরত সাহেবের সম্মুখে গিয়া একটু দূরে চাটাই-এ বসিতাম। কিন্তু পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া তাঁর নিকট কম্বলের উপর বসাইতেন। ক্রমেই যেন আমাকে নিকট হইতে নিকটতর করিয়া লইলেন। আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যে, দৈহিক নৈকট্য যেন আত্মিক নৈকট্যের সহায়তা করিতেছে।

কাদিয়ানে থাকিয়া আমি নানাভাবে হযরত মির্জা সাহেবের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কোরআন হাদিস আমার জানা ছিল না,

কাজেই আমি সেদিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। **Common sense** বা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। হিন্দু শিখ, অমুসলমান যাহারা কাদিয়ানে বাস করিত তাহাদের নিকট হযরত মির্জা সাহেবের স্বভাব চরিত্র, আচরণ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করিতাম। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। আহ্‌মদী গণের দৈনন্দিন জীবন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতাম। তাহাদের অনাড়ম্বর সাদাসিদা জীবন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ "সাদাসিদে জীবন-যাপন এবং উচ্চ চিন্তা আমাকে বড় মুগ্ধ করিত। **Plain living and High thinking**-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহাদের মধ্যে পাইতাম।

আহ্‌মদীয়া সাহিত্য) বিশেষতঃ **Teachings of Islam** হযরত মির্জা সাহেবের اسلامی اُصول کی فلسفی গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ বর্ত্তমানে আমেরিকান সংস্করণে উহার নাম দেওয়া হইয়াছে—**Philosophy of the Techings of Islam**-এই নামটিই উর্দু নামের অনেক নিকটে) 'ইস্লামের শিক্ষা" বইখানি আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। **Review of Religions** (ইং) নিয়মিতভাবে পড়িতাম। আহ্‌মদীয়া মতবাদ প্রচারে এই মাসিক পত্রিকাটি অনেক সাহায্য করিয়াছে—এবং করিতেছে। ইহা ১৯০২ ইং সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব; তিনি ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ইহা দক্ষতার সহিত চালাইয়াছিলেন। তখন আমি উর্দু ভাষা অতি সামান্যই জানিতাম। অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে কাদিয়ানের শিক্ষিত লোকেরা উর্দুতে কথাবার্তা বলিতেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে সাধারণতঃ পাঞ্জাবী ভাষা বলিতেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, উর্দু ভাল না জানায় আমি ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে বেশী মিশিতাম। তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ মৌলবী মহাম্মাদ আলী সাহেবের সঙ্গেই আমার মেলা মেশা সবচেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু তিনি সারাদিন কাজে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, বসিয়া গল্পগুজব করার সময় তাঁহার মোটেই ছিল না। তাঁহাকে একদিন বলিলাম, "মৌলবী সাহেব, আহ্‌মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমি আপনাকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করি; কিন্তু আপনাকে তো পাওয়া দায় আপনার সময় মোটেই নাই। অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যহ আমাকে কিছু সময় দেওয়ার উপায় করুন। তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, "আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে ফজরের নমাজের পর ও আছরের নামাজের পর মাঠে বেড়াইতে যাই। আপনি আমার সঙ্গে যাইবেন, বেড়াইতে বেড়াইতে কথাবার্তা হইবে।" আমার জন্য ইহা অত্যন্ত সুবিধা জনক বন্দোবস্ত হইল। এইভাবে প্রতিদিন প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁর সাহচর্য লাভ করার সুযোগ হইত।

মৌলবী মহাম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই বিশেষতঃ হযরত মির্জা সাহেব সম্বন্ধে কতকগুলি এমন ঘটনা জানিতে পারিয়াছিলাম, যাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তালার সঙ্গে তাঁর যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল। একবার যখন কাদিয়ানে প্লেগ লাগিয়াছিল এবং হযরত মির্জা সাহেবের বাড়ীর চতুর্দিকে ঐ রোগ দেখা গিয়াছিল তখন মৌলবী মহাম্মাদ আলী সাহেবের খুব প্রবল জ্বর হয়, মৌলবী সাহেবের ধারণা হইল তাঁহারও প্লেগ হইয়াছে, তিনি জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া কাঁদিতেছিলেন। হযরত মির্জা সাহেব (আলায় হে-স্‌সালামও) সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তখন মৌলবী সাহেব কাদিতেছিলেন। হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মৌলবী সাহেব, আপ্‌কো আগর প্লেগ হ্যায় তো মাঁই ঝুটা হুঁ। আল্লাহ্‌ তালা কা ওয়াদা হ্যায় কে, তেরে ঘর মে তাউন নেহি হোগা।" তিনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই মৌলবী সাহেবের জ্বর কমিতে লাগিল এবং তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। কাদিয়ানে কয়েকবার

প্লেগ হইয়াছে; কিন্তু হযরত মসিহ্‌ মাউদ আঃ) বাড়ীতে বা তথাকার কোনও আহ্‌মদীর প্লেগ হয় নাই।

মৌঃ মহাম্মাদ আলী সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি দুর্বলতা পূর্বে ছিল। তিনি পূর্বে চেষ্টা করিয়াও তাহা দূর করিতে পারেন নাই; কিন্তু হযরত মির্জা সাহেবের (আঃ) হাতে বয়েত করার পর হইতে সেই দোষগুলি আপনা আপনি দূর হইয়া গিয়াছে।

মৌলবী সাহেব বলিয়াছেন, 'হযরত মির্জা সাহেব (আঃ) সর্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন, তাঁর হৃদয় যেন আনন্দে ভরা ছিল, যেন তিনি এমন কিছু পাইয়াছেন যে জন্য নিজ জীবন কৃতার্থ মনে করিতেন। অনেক সময়ে আমি নানা রকম সমস্যায় পড়িয়া বিষন্ন হইয়া পড়িতাম, কিছুতেই মনে শান্তি পাইতাম না, তখন হযরত সাহেবের কাছে গিয়া বসিলে মনের সকল দুঃখ, সকল বিষন্নতা দূর হইয়া যাইত। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এক ব্যক্তি আগুনের কাছে গেলে যেমন আরাম পায়, আমারও তাহাই হইত। হযরত যেন আনন্দের ফোয়ারা ছিলেন।"

হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এলহাম সম্বন্ধে মৌলবী মহাম্মাদ আলী সাহেব বলিতেন, "এল্‌হামগুলি যে, সত্যই খোদাতালার নিকট হইতে তিনি পাইতেন তার একটা বড় প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত ঐশীবাণীতে ভবিষ্যতের খবর থাকিত, তাঁর নিজের সম্বন্ধে সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধবদের সম্বন্ধে, এবং দুনিয়ার অনেক বড় বড় ঘটনা সম্বন্ধে। তাঁহার বহু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, হইতেছে, এবং ইহার দ্বারা ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, নিকট বা ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী-গুলিও পূর্ণ হইবে। ইহার সত্যতা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ আউয়াল রাজি আল্লাহু আনহুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আল্লাহ্‌তালাকে পাইয়াছেন। যদি পাইয়া থাকেন তবে তার প্রমান কি?' তিনি বলিলেন, "খোদাকে পাওয়া মানে এ নয় যে, খোদা একটা প্রতিমার মত কিছু; তাকে দেখিলাম এবং পাইলাম। খোদাতালাকে পাওয়া মানে তাঁর গুণগুলি স্বধু স্বীকার করিয়া লওয়া নয়, সেগুলি উপলব্ধী করা। যেমন আল্লাহ্‌তালার একটী গুণ হইল যে তিনি আমাদের প্রার্থনা মুঞ্জুর করেন। যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া ফল পাওয়া যায় তখন স্পষ্ট বুঝা গেল তিনি দোওয়া কবুল করেন। এইরূপে আল্লাহ্‌তালার অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান বা মারফত হাসেল করা যায়। আল্লাহ্‌-তালার দয়ায় আমারও ইহা অনেকটা হইয়াছে। মানুষ নিজ জীবনে আল্লাহ্‌তালার গুণগুলি যত উপলব্ধি করে এবং নিজেও যতটা পারে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয় সে ততটা আল্লাহ্‌তালার নৈকট্য লাভ করে যেমন লোহা আগুনে পোড়াইলে আগুনের গুণগুলি প্রাপ্ত হয়।

একদিন হযরত খলিফা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌তালাকে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কি? তিনি একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন (আরবী অক্ষরে) আল্লাহুম্মা সল্লেআলা মহাম্মাদে ওয়া আলাআলে মহাম্মদেন্‌ অ বারেক্‌ ওয়া সল্লম অর্থাৎ—হে আল্লাহ্‌তালা হযরত মহাম্মাদ ও তাঁহার বংশাবলী ও উম্মতের উপর অসীম রহমত ও বরকৎ বর্ষণ কর। তিনি বলিলেন, "ইহা শুধু মন্ত্র আওড়ানের মত পড়িবে না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণের ইসলাম সেবা ও প্রচারের জন্য অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার স্মরণ করিয়া বার বার দরুদ পড়িবে। (উপরোক্ত আরবী বাক্যকে দরুদ বলে) দরুদের তাৎপর্য আমি প্রথম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। আমি মনে করিতাম রসুলুল্লাহ [(সাঃ-ও তাঁহার সাহাবীগণ (রাঃ)] এত উচ্চদরের লোক যে তাঁহাদের জন্য আমার মত পাপীর

প্রার্থনার কি মূল্য থাকিতে পারে? এখন বুঝিয়াছি দরুদের অন্তর্নিহিত ভাবটী কত গভীর, কত উচ্চ, এবং কত ব্যাপক। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক গুণ। একজন রাজাও যদি একটি সামান্য ভিক্ষুককে দুইটা পয়সা দান করেন; ভিক্ষুক তখন অন্য প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিয়া বলে, "আল্লাহ্‌তালা হুজুরের মঙ্গল করুন।" ইসলামের মূল্য যখন বুঝা যায় তখন ইহার জন্য আঁ হযরতের কষ্ট ত্যাগ স্বীকারের মূল্যও বুঝা যায়। যিনি এত কষ্ট করিয়া এত মহামূল্য দান আমাদিগকে দিয়াছেন তাঁহার ও তাঁহার সাহাবীগণের জন্য আল্লাহ্‌তালার নিকট প্রার্থনা আমাদের নিশ্চয়ই করা উচিত। তাঁহারা আল্লাহ্‌তালার প্রিয়পাত্র; সুতরাং প্রিয়পাত্রের জন্য যে প্রার্থনা করে, সে নিজেও আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহ লাভ করে, যেমন মায়ের সন্তানকে যে ভাল বাসে, মা তাহাকেও ভালবাসে। সুতরাং আঁ হযরতের জন্য দোওয়া করিলে প্রকারান্তরে আমার নিজের জন্যই দোওয়া করা হয়। আঁ-হযরতের জন্য দোওয়ার অর্থ কি? যাহা তাঁহার কাম্য তাহাই চাওয়া। হযরতের কাম্য কি ছিল? সমস্ত মানব মণ্ডলী ও জীবজগত সুখে শান্তিতে থাকুক। সুতরাং আমরা যখন দরূদ পড়ি তখন সমস্ত মানব মণ্ডলী ও জীব-জগতের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। যখন ঐ রূপ ভাবে প্রার্থনা করা যায় তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-ও তাঁহার সাহাবীবৃন্দের (রাঃ) জীবনী সম্বন্ধে, ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য, নেকির জন্য তাহাদের অভাবনীয় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ত্যাগের কথাও মনে পড়ে এবং সেই স্মৃতি হইতে এক পবিত্র প্রেরণা লাভ করা যায়।

এই রূপে নানাভাবে অনুসন্ধান, চিন্তা ও দোওয়া করিয়া যখন পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম যে, হযরত মির্জা সাহেব (আঃ) সত্য সত্যই একজন যুগ পরিবর্তনকারী ধর্মবীর ও মহামানব ছিলেন তখন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসলামের সেবায় জীবন নিয়োজিত করাই স্থির করিলাম। হযরত খলীফা সাহেব (রাঃ) কে মনের ভাব জানাইলাম তিনি বলিলেন, "তোমার এখনও বয়েৎ করার সময় হয় নাই।"

হযরত মুফ্‌তি মহাম্মাদ সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা বার্তা হইল। ইনি তখন "বদর" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বড় বড় তোলা চোখ গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা, বেশ মিস্তুক ভদ্রলোকটি। তাঁহার আফিসে যাইতেই বেশ আদর করিয়া বসাইলেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হযরত মির্জা সাহেব (আঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ ও মাহ্‌দী হিসাবে কি কাজ করিয়া গিয়াছেন? তিনি বলিলেন, "হযরত মির্জা সাহেব (আঃ) চারিটি কাজ করিয়াছেন:—

(১) হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যে ইসলাম রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি জগতের সম্মুখে সেই ইসলামকে তুলিয়া ধরিয়াছেন অর্থাৎ কোরআনের ইসলাম, যাহা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম, যে ইসলাম দ্বারা এই দুনিয়াতে এবং এই জীবনেই খোদাতালাকে লাভ করা যায়, ব্যক্তি এবং জাতি হিসাবে সাংসারিক ও আত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

(২) বর্তমান মুসলিমগণের ধর্ম বিশ্বাসের বা আকায়েদের মধ্যে যে সব গলদ ঢুকিয়াছে তাহা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।

(৩) ইসলামের প্রতি বহিরাক্রমন হইতে ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন। নাস্তিক, হিন্দু, খৃষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি নানাদিক হইতে ইসলামের উপর যে সব আক্রমন হইতেছিল তিনি সেগুলি হইতে ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন; বিশেষ করিয়া প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্মে যে সব ভুল বিশ্বাস আছে তাহা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।

(৪) তিনি এমন এক জমাত রাখিয়া গিয়াছেন যে জমাত তাঁহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার করিতে পারে।

বয়েৎ না করিতে পারায়, মনটা খুব অস্থির হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতেই পারিলাম না। পর দিন পকালে হযরত খলিফা সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে শুনিলাম তিনি নবাব সাহেবের বাড়ীতে গিয়াছেন। মালের কোটলার নবাবের এক নিকট আত্মীয় হযরত মহাম্মাদ আলী খাঁ সাহেব (রাঃ) হযরত মির্জা সাহেবের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সপরিবারে কাদিয়ানে হিজরত করেন। তিনি তদানিন্তন হাই-স্কুলের উত্তর পার্শ্বে মাটির দেওয়ালের বাড়ী তৈয়ার করাইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পরিবারে কাহারও অসুখ হওয়ায় হযরত খলিফা সাহেব (রাঃ)-কে চিকিৎসার্থ ডাকাইয়াছিলেন। আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নবাব সাহেব ও হযরত সাহেব বসিয়া আছেন। আমি গিয়া সালাম দেওয়াতে হযরত সাহেব (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "হুজুর, বয়েৎ করিতে যাই, বয়েৎ না করিলে মনে শান্তি পাইতেছি না।" তিনি বলিলেন, "হাঁ এখন সময় হইয়াছে, আইস," এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বয়েতের বচনগুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিলাম। তখন আমার বিগত-জীবনের পাপগুলি সব স্মরণ হইতে লাগিল এবং অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলাম এবং এত কান্না পাইতে লাগিল যে, তৎপূর্বে বা পরে সেরূপ কান্না কখনও কাঁদি নাই। বয়েৎ করার পর মনটা যেন বেশ হালকা বোধ হইল। আমি যেন এমন ব্যক্তিকে পাইলাম যাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পন করিয়া মনে বিশেষ শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। হযরতকে বলিলাম, "হুজুর, আপনি যদি আমাকে উচ্চ গাছে চড়িয়া উপর হইতে লাফ দিতে আদেশ দেন আমি এখন তাহাও দিতে পারি।" বাবাজানের উপদেশমত অজিফা পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া যে মূর্ত্তিকে দেখিয়াছিলাম এ সেই মূর্ত্তি। বয়েৎ করার ২।১ দিন পর আমি হযরৎ সাহেব (রাঃ)-কে বলিলাম, "হুজুর আমি কয়েক বৎসর যাবত **Dispepsia** (পেটের ব্যারামে) ভুগিতেছি, আমাকে পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করুন। হুজুর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মোবারক আলী তোমার কোন ব্যারাম নাই, পরিপাক শক্তি একটু কম মাত্র। তুমি দুই বেলা একটু করিয়া দুধ খাইবে। আহারের পর **Tine Asafathida** (হিং এর আরক) পাঁচ ফোটা করিয়া পানির সঙ্গে মিশাইয়া খাইবে, দুইবেলা খুব বেড়াইবে। তোমার শরীরের জন্য আর কিছুরই দরকার নাই।" সেইদিন হইতে আমার রোগ কমিতে লাগিল। আমি সেই সময় পিতাকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, যে বুজুর্গকে আমি আপনার উপদেশ মত অজিফা পড়িয়া কাশফে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার হাতে বয়েৎ করিয়াছি। খোদার ফজলে আমি এখন নিরোগ।

আমার বোধ হইতেছিল, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন খলিফা ছিলেন তখন মদিনার যে অবস্থা ছিল, এখন হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর ওফাতের পর হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ আউয়ালের (রাঃ) সময়ে কাদিয়ানের যেন অনেকটা সেই অবস্থা। রুহানী হিসাবে কাদিয়ান সামান্য একটি গ্রাম হইলেও, যেন পৃথিবীতে একটি স্বর্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল। হযরত খলিফা সাহেবের অনুমতিক্রমে আমি উকিলউদ্দিন খন্দকারকে এই মর্মে এক চিঠি লিখিয়া কাদিয়ানে একবার আসার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। কয়েকদিন পর সে আসিল এবং আমার সঙ্গে থাকিতে লাগিল। হযরত খলিফা সাহেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর ঘরে গিয়া খন্দকার

বলিল, "ভাই, এ বুড়ো তো অদ্ভুত লোক; তিনি আমার দিকে যখন তাকাইলেন তখন আমার বোধ হইল তাঁহার চক্ষু যেন ষ্টিমারের সার্চ-লাইট (Search Light); এবং আমার শরীর আপাদ মস্তক ফাঁক। তিনি আমার ভিতরে কি আছে সব যেন দেখিতে পাইলেন।" আমরা প্রত্যহ মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় বেড়াইতাম, সেই সময় খন্দকার তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিত এবং উত্তরগুলি তাহার ভালই লাগিত। কাদিয়ান ত্যাগের পূর্বে খন্দকার একদিন আমাকে বলিল, "আমি বলিতে গেলে ব্রাহ্ম ছিলাম, এখানে আসিয়া বুঝিলাম ইসলামই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মুসলমানদের মধ্যে আহ্‌মদী সমাজই শ্রেষ্ঠ মুসলিম সমাজ।" কিন্তু সে বয়েৎ করিল না। একদিন কথায় কথায় আমাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "খলিফা সাহেবের কাজ কি লর্ড কার্জনের কাজের চেয়ে বেশী গুরুতর, বেশী মূল্যবান?" লর্ড কার্জন তখন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি ও বড়লাট। তখন আমি কি উত্তর দিয়াছিলাম আমার মনে নাই; কিন্তু সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইল না। একজন নবীর স্থান যেমন রাজা বাদশাদের স্থানের অনেক উর্ধে তেমনি নবীর যিনি প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত তাঁহার স্থানও সম্রাটের বহু উর্ধে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের চেয়ে কত বড় ছিলেন! হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-ও রুম এবং ইরাণের সম্রাটদের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলিফাগণের ভয়েও বড় বড় রাজ-রাজারা কাঁপিতেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ও তাঁহার স্থলাভিসিক্ত খলিফাগণও দুনিয়াবী রাজাদের অনেক উর্ধে, তবে সাংসারিক হিসাবে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। হযরত ইসা (আঃ)-এর প্রথম যুগের উম্মতদিগকেও প্রায় ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত দুনিয়ার বক্ষে সামান্যই বোধ হইয়াছিল।

আমরা হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ)-এর বাড়ীর পূর্ব-দক্ষিণ ধারে গলির পূর্ব-ধারে একটা ছোট কামরাতে থাকিতাম। আমাদের পাশের কামরায় একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবক থাকিতেন, তিনি নূতন আহ্‌মদী— নাম মহম্মদ ইউছুফ, পূর্ব নাম সুরেশ সিং; ইনি শিখ ছিলেন, হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) হাতে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রত্যহ প্রাতে কোর্‌আন মজিদ ও গ্রন্থ সাহেব (শিখদের ধর্ম পুস্তক) পড়িতেন। ইনি পরে "নূর" নামক একটি সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকা আজীবন চালাইয়া হিন্দু ও শিখদের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বাবা নানকের জীবনী লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাবা সাহেব একজন মুসলমান ও অলি আল্লাহ্‌ ছিলেন। হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষাতে কোরআন মজিদের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকজন দেশীয় হিন্দু ও শিখ রাজাদিগকে তাঁহার অনুদিত গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছিলেন। রাজাগণ সাদরে উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া মুহাম্মদ ইউছুফ সাহেবকে পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং তাহাদের দরবারে তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

কোরআন মজিদ পড়া আরম্ভ। একদিন হযরত খলিফা সাহেব (রাঃ)-কে বলিলাম, "হুজুর কোরআন পড়িয়া ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিব, ইহা আমার দ্বারা হইবে না, কারণ আমি আরবী জানি না। আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া কোরআন মজিদ অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে দুরুহ ব্যাপার। কোরআনের মধ্যে কি আছে আমাকে মোটামুটি সংক্ষেপে বলিয়া দিন, তাহাই আমার জন্য যথেষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, "মোবারক আলী! তুমি ভয় করিও না। তোমার কোরআন শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, যাহাতে আরবী ভাষাও শিক্ষা হইবে, কালামুল্লাহ্‌ও শিখিতে পারিবে। এই কেতাব আল্লাহ্‌-তালার বাণী, ইহা শুধু পণ্ডিতদের জন্য নয়, সর্ব-

সাধারণের জন্য। এ কেতাবের ভাষা খুব প্রাঞ্জল। প্রথম কয়েকটা ছুরার অর্থ শিখিলে অন্য ছুরাগুলির অর্থ শিক্ষা করা অনেক সহজ হইবে। তিনি মৌলানা সুফি গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব বি, এ, কে আমার কোরআনের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সুফি সাহেব মৌলবী ফাজেল এবং আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। হাইস্কুলের হেড্ মৌলবী ছিলেন। হযরত খলিফা সাহেবের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে তিনি এইভাবে পড়াইতেন যেমন بسم الله (বিস্‌মিল্লাহ) ইহাতে তিনটি শব্দ আছে, بـ + اسم + الله | بـ অর্থ সহিত, اسم অর্থ নাম এবং আল্লাহ্ অর্থ পরম সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধাতা। মোটের উপর অর্থ হইল আল্লাহ্‌তালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)। সুফি সাহেবের গলার আওয়াজ বড় সুন্দর ছিল এবং তিনি কোরআনের আয়েতগুলি এত সুন্দরভাবে ও মিষ্ট স্বরে পড়িতেন যে, অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। কাদিয়ানের সালানা জলসার উদ্বোধনী উপলক্ষে কোরআন তেলাওত প্রায়ই তিনি করিতেন। হযরত খলিফা সানি (আইঃ) খলিফাপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই তাঁহাকে মরিশাস দ্বীপে প্রচারের জন্য যাইতে আদেশ করেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তথায় যান এবং প্রায় ১২ বৎসর কাল দক্ষতা এবং সাফল্যতার সহিত তথায় প্রচারকার্য করিয়া দেশে ফিরেন। মরিশাসে তাঁহাকে অনেক বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এমনকি আদালতে মামলা মকোদ্দমাও হইয়াছিল।

কাদিয়ান হইতে বাংলায় আগমন

কাদিয়ানে এইরূপ মাস দেড়েক থাকার পর এক দিন চাচার নিকট হইতে টেলিগ্রাফ পাইলাম, 'শীঘ্র আইস; কমিশনার সাহেবের সহিত (**Interview**) দেখা করিতে হইবে।" মনি অর্ডার যোগে তাঁহার নিকট হইতে রাস্তা খরচও পাইলাম। হযরত সাহেব (রাঃ) কে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "যাও"। আমি বলিলাম, "ইনশা আল্লাহ্ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" তিনি বলিলেন, "শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেও পারো, নাও আসিতে পারো।" আমার কাদিয়ানে থাকারই ইচ্ছা ছিল, এই জন্য শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে পারিব, তখন এই বিশ্বাসই ছিল।

উকিলুদ্দিন ও আমি এক সঙ্গে রওনা হইলাম। আম্বালা জংশনে আসিয়া আমরা আলাদা হইলাম। খন্দকার দিল্লী আগরা দেখার জন্য দিল্লীর পথে গেল, আমি লক্ষ্ণৌর পথ লইলাম। বিদায় লইবার সময় খন্দকার আমাকে বলিল, "তুমি কাদিয়ানে বয়েত করিয়াছ, এ কথা দেশে গিয়া প্রকাশ করিও না। এমাম মাহ্‌দী আসিয়াছেন, একথা লোকে বিশ্বাস করিবে না, তুমি অনেক অসুবিধায় পড়িবে।" আমি বলিলাম, "আমি যাহা বিশ্বাস করিয়াছি তাহা বলিব ইহার ফল যাহা হয় হইবে।"

জলপাইগুড়িতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। সেই বার নাটোরের আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। **Interview** এ তিনিও গিয়াছিলেন। চাকুরী কাহারও ভাগ্যে জুটিল না। তিনি ছিলেন এম, এ, এবং উচ্চ বংশের লোক। বগুড়ার হাফিজউদ্দিন খন্দকার উকিল (পরে খান বাহাদুর ও এম, এল, সি হইয়াছিলেন) তাঁহার ভগ্নি-পতি হইতেন। হাশেম সাহেবকে পূর্বেও বগুড়ায় দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তখন আলাপ পরিচয় হইয়াছিল না।

কিছুদিন বাড়ীতে কাটান গেল। আমি রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ি, কোরআন মজিদ পড়ি, স্বাস্থ্যও অনেকটা ভাল; এইসব দেখিয়া পিতা খুশী হইলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, "আপনার ছেলে কাদিয়ানী কাফের হইয়াছে।" তিনি বলিতেন, "সে

তো আগে নমাজও পড়িত না, এখন রীতিমত নমাজ ও কোরআন পড়ে। ইসলামের প্রতি তার মহব্বত দেখা যায়, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভক্তি করে, আমি তো দেখি সে পূর্বের চেয়ে ভাল মুসলমান হইয়াছে।" সত্যই কাদিয়ানে বয়েত করার পর হইতে আমার শারিরীক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হইতে লাগিল। আমার চরিত্রের যে সব দোষ পূর্বে কিছুতেই দূর করিতে পারি নাই, সেগুলি যেন আপনা আপনি দূর হইয়া গেল। আমার জীবনের এক নূতন উন্নততর অধ্যায় শুরু হইল।

চাকুরীতে প্রবেশ

কিছুদিন বাড়ী থাকার সময় বন্ধু বান্ধব বলিল, 'তুমি শিক্ষা বিভাগে চেষ্টা কর, ডেপুটি-ইনস্পেক্টরের পদ চাওয়া মাত্র পাইবে।" তখন খান বাহাদুর আছানউল্লাহ্ সাহেব রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন; আমি জলপাইগুড়িতে (তখন বিভাগীয় হেড্ কোয়ার্টার বা সদর জলপাইগুড়িতে ছিল) তাঁহার সহিত দেখা করিয়া এক দরখাস্ত দিলাম। তিনি বলিলেন যে, আমার জন্য সুপারিসসহ ঐ দরখাস্ত তিনি উপরে পাঠাইবেন। চাকুরী পাইলাম, কিন্তু সাব-ইনস্পেক্টরের মাসিক বেতন ৫০৲ হিসাবে শুরু হয়; কিন্তু আমাকে ৭৫৲ দেওয়া হইল। কার্যে তখনও হাজির হই নাই, এমন সময়ে ঢাকায় নবাব আলী চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। তখন পূর্ব-বঙ্গীয় (তখন ইংরেজরা বাংলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল) আইন সভার জন্য ইলেক্শনের সময় চৌধুরী সাহেব ও মোঃ সামশুল-হুদার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। নবাব আলী চৌধুরী একজন জমিদার ছিলেন এবং রাজনীতি করিতেন। ইনি পরে খান বাহাদুর, নবাব এবং স্যার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বানার্জীর সঙ্গে মন্ত্রিও হইয়াছিলেন। মোঃ সৈয়দ সামশুল হুদা এম, এ, বি, এল, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। ইনিও পরে নবাব এবং "স্যার" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার পক্ষে ক্যানভাস্ করার জন্য আমাকে শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন, আমি "না" করিতে পারিলাম না। ঢাকা হইতে ষ্টিমারে রওনা হইয়া সুনামগঞ্জে গেলাম। তখন আসাম "পূর্ব বাংলা ও আসাম" প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ১৯০৯ সনের কথা। সুনামগঞ্জে কিছু দিন ক্যানভাস্ করিয়া ফিরিলাম। সুনামগঞ্জের জমিদারেরা সে যুগে বুলবুলি ও ষাঁড়ের লড়াই লইয়া খুব ব্যস্ত থাকিত। লেখাপড়া জ্ঞানচর্চার ধার ধারিত না। সাধারণ লোকের নিকট তাহারা ছিল দেবতা। ফিরিবার সময়ে ষ্টিমারে আমি ইণ্টার-ক্লাশে ছিলাম; কিন্তু সুখময় চৌধুরী নামক আসামের একজন জমিদার আমার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমন করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল, তাঁহার ছোটভাই ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সমপাঠী ছিল। সুখময় বাবু ইণ্টারক্লাশে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিতেন। ষ্টিমার ভ্রমন শেষ করিয়া যেদিন ঢাকায় পৌছার কথা সেইদিন সুখময় বাবু আমাকে বলিলেন, "আপনার হাতখানা দেখি।" আমি হাত দেখাইলাম। তখন উনি বলিলেন যে,

উনি পামিষ্ট্রী (Palmistry হাতের তালুর রেখা ইত্যাদি দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করা) বিদ্যার চর্চা করেন। আমার সম্বন্ধে গণনা প্রায় শেষ হইয়াছিল, শুধু হাত দেখা বাকী ছিল। বলিলেন, "আপনার পিতা বা মাতা কেহ কি আপনার শিশুকালে মারা গিয়াছিলেন?" আমি বলিলাম "না, উভয়েই জীবিত আছেন।" আমি লেখাপড়া শিক্ষার সময়ে প্রায় অনেকটা চাচা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছি, একথা, শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বলা ঠিকই হইয়াছে, কারণ, পিতা বর্তমান থাকিলেও আপনার প্রতিপালন, বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি তাঁর দ্বারা খুব সামান্যই হইয়াছে।" তারপর তিনি বলিলেন, "আপনি বিদেশে বাস করিবেন।" আমি বলিলাম, "আমি তো এখন এই দেশেই চাকুরী লইতেছি, বিদেশে বাস আমার কি করিয়া হইতে পারে?" তিনি বলিলেন, "আপনি এ চাকুরীতে বরাবর থাকিবেন না, এ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বিদেশে বাস করিবেন।" আমি চাকুরী ছাড়িয়াও ছিলাম, বিদেশে কিছুদিন বাসও করিয়াছিলাম কিন্তু কার্য্যতঃ এখন পর্য্যন্ত (১৯৫৫) দেশেই বাস করিতেছি। কাদিয়ানে বাড়ী করার জন্য যায়গা খরিদ করিয়াছিলাম; কিন্তু ১৯৪৭ হইতে এখন (১৯৫৫) পর্যন্ত কাদিয়ান ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। হযরত মসিহে মউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাদিয়ান ইন্‌শাআল্লাহ্‌তালা একদিন আহ্‌মদী জমাতের হাতে আসিবে; কিন্তু এখনও আসে নাই। সুখময় বাবু আমার আয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ৬৫ হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে, ৭৩ এর উপর যাইবে না, কিন্তু আমি এখন (১৯৫৫ সালে) খোদার ফজলে ৭৫ বৎসরে পড়িয়াছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "যৌবনে স্বাস্থ্যহীন হইলেও পরিণত বয়সে আপনি ভাল স্বাস্থ্য লাভ করিবেন।" একথা অনেকটা ঠিক হইয়াছে। বিবাহ দুইটা হইবে বলিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক হইয়াছে।

১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে (যতদূর মনে হয় ৬ই ডিসেম্বরে) আমি পাবনা জেলার দুলাই সার্কেলের স্কুল সাব-ইনস্পেক্টরের কাজে যোগদান করি। তখন মাহিনা মাসিক ৫০ হইতে আরম্ভ হইত; কিন্তু আমাকে প্রথমেই ৭৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। পাবনা যাইবার সময়ে সাড়াঘাট হইতে বাজিতপুরঘাট পর্য্যন্ত ষ্টিমারে যাইতে হইত। তখনও হার্ডিঞ্জব্রিজ হয় নাই। ষ্টীমারে মৌঃ মুহম্মদ ইয়াছিন সাহেব আমার সহযাত্রী ছিলেন। তখন তিনি পুলিস সাব ইনস্পেক্টর। তাঁহার সঙ্গে বেশ আলাপ হইল, তাঁহাকে মার্জিত রুচী, উদারভাবাপন্ন, এবং চরিত্রবান লোক বলিয়া বোধ হইল। ইনি পরে আহ্‌মদী হইয়াছিলেন, এবং প্রথম সাক্ষাতে তাঁহাকে আমি হযরত এমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের পয়গামটা যে দিই নাই, আমার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ তাঁহার চিরকাল ছিল। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে মরহুম আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেব আমাদের সঙ্গে কাদিয়ানে গিয়া আহ্‌মদী মত গ্রহণ করেন; তারপরেই তাঁহার ছোট ভাই আবুল হাছেম খাঁ চৌধুরী (বকু মিঞা)-ও আহ্‌মদী হন। এসব কথা সবিস্তারে যথা সময়ে ইনশাআল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করিব। সেই সময় ঘটনাক্রমে মৌঃ মহাম্মদ ইয়াছিন সাহেব নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসেন। বকু মিঞার (আবুল আছেম খাঁ চৌধুরী) নিকট শুনিয়াই তিনি আহ্‌মদী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তখন মৌঃ সৈয়দ মোহসেন আলী সাহেব পাবনার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর (স্কুলের) ছিলেন। তিনি খুব অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন, সমাজ হিতৈষী বলিয়া বোধ হইত। আমার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নিকট আমি কাদিয়ান ও আহ্‌মদী জমাতের কথা বলিতাম, তিনি শুনিতেন; কিন্তু আমার সাক্ষাতে কোনও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেন না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি মুঙ্গেরের পীর মুহাম্মাদ আলীর ভক্ত ছিলেন এবং পীর সাহেবের ন্যায় আহ্‌মদী বিদ্বেষী

হইয়াছিলেন। আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে লিখিত পীর সাহেবের একখানা কেতাবের বাংলা তর্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি ব্যারাম ছিল, সময়ে সময়ে তিনি হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্য ফিট (অজ্ঞান) হইয়া যাইতেন। সে অজ্ঞানাবস্থা এক আধ মিনিটের বেশী থাকিত না, কিন্তু তার ফল মাথার জন্য খারাপ হইত। পেটে এক রকম বিষাক্ত বায়ু জমিত, তার ফলেই এরূপ হইত বলিয়া ডাক্তার ও হেকিমগণ তাঁহার রোগের ব্যবস্থা করিতেন। সৈয়দ মোহসেন আলী সাহেবের প্রথম মেয়েকে নিজের ভাতিজার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি প্রথমে মারা যায়, তারপর জাম ইটিও রেলওয়ে দুর্ঘটনায় মারা যায়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সৈয়দ মোহসেন আলী সাহেবও মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী ও এক মাত্র শিশু কন্যা জীবিত ছিল।

মাস ছয়েক আন্দাজ স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্টরী করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পাঠশালা দেখার কাজ আমার ভাল লাগিতেছিল না। ইতি মধ্যে ঢাকা টিচার্চ্ছ ট্রেনিং কলেজ খোলা হইলে আমি উক্ত কলেজে ট্রেনিং এর জন্য চলিয়া যাই। সব-ইন্‌স্পেক্টরী জীবনের একটা রাত্রির কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন খুব সম্ভব বৈশাখ মাস, বিলখাড়ি সব শুকিয়া গিয়াছে। একটা প্রকাণ্ড শুকনা বিলের এক প্রান্ত হইতে অল্পবেলা থাকিতে গরুরগাড়ীতে বিলের ভিতরকার রাস্তা দিয়া রওনা হওয়া গেল। কিছুক্ষণ গিয়াই সন্ধ্যা হইল এবং ভীষণ অন্ধকার নামিয়া আসিল। আমরা সোজা চলিতে লাগিলাম, কিন্তু মাঠের রাস্তা, আর দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে আলেয়ার আলো দেখা যাইতে লাগিল। ইহাকে ভূতের আগুন মনে করিয়া গাড়োয়ান ও আমার চাকর দুইজনই অত্যন্ত ভয় পাইল। চাকরটি তো ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তাহাদিগকে নির্ভয় দিতে লাগিলাম কিন্তু উহারা আশ্বস্ত হইল না। আমিও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম; ভূতের ভয়ে নয়, অন্ধকারে অনিশ্চিত ভাবে কোথায় যাইতেছি, পথের শেষ হয় না, এই জন্য। কোনো আলো দেখিয়া সেই দিকে গাড়ী চালাইলে দেখা গেল যে, আলো নিবিয়া গিয়াছে। মেঘ ছিল, দুই এক ফোটা বৃষ্টিও পড়িতেছিল। এই ভাবে শুকনা বিলের ভিতর দিয়া যতই যাই কোনও গ্রাম পাওয়া যায় না। অবশেষে দূরে একটা আলো দেখা গেল, সেটা বেশ স্থির বলিয়া বোধ হইল। আলেয়ার আলো এক স্থানে স্থির থাকে না, নড়াচড়া করে। আমি বলিলাম ঐ-স্থির আলোর দিকে গাড়ী চালাও। কিছু দূরে গিয়া অন্ধকারে একটা বাড়ী দেখা গেল। আমরা সেই বাড়ীতে গিয়া নামিলাম। গরীব গৃহস্থের বাড়ী, ডাকাডাকি করাতে ভিতর হইতে জন দুই লোক আসিল। আমরা বলিলাম, "আমরা রাতটা এখানে কাটাইতে চাই। সেই দুপুর রাত্রে তাহারা অতিথিকে কিছুতেই না খাওয়াইয়া ছাড়িবে না। মুর্গির মাংস ও ভাত পাক হইল। ঐ-রাত্রেই গাই দোয়ান হইল। আমাদিগকে খাইতে দিয়া একজন ঘরের চালের উপর উঠিয়া খড়ের চালের উপর কাঁথা বিছাইয়া দিল, কারণ মেঘ আছে, বৃষ্টি ফোটা ফোটা পড়ে, পাছে বেশী বৃষ্টি আসিয়া আমাদের আরামে শুইয়া থাকায় ব্যাঘাত না করে। গৃহস্থরা লেখাপড়া জানে না, তার মূল্যও বোঝে না। কিন্তু তাহাদের অতিথি পরায়ণতা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। স্বদেশের লোকের চরিত্রের এই দিকটা দেখিয়া বেশ একটু গর্ব বোধ করিতেছিলাম। উহাদিগকে আমরা বলিয়া দিয়াছিলাম যে, আমরা পুলিসের লোক নই, আমরা স্কুলের কাজ দেখা শুনা করি। সে গ্রামে কোনো স্কুলও ছিল না। সহরে এরূপ অতিথি পরায়ণতা দেখা যায় না। ইউরোপের সহরে যাহা দেখিয়াছি সে তো আরও মজার ব্যাপার। আমি বার্লিনে

থাকিবার সময়ে একজন তুর্কি ভদ্রলোক আমাদের লণ্ডন মিশন হইতে আমার নাম ঠিকানা লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তিনি কোনো দিন ইতিপূর্বে বার্লিনে আসেন নাই। ঘটনা ক্রমে সেদিন আমি বার্লিন হইতে কোথায় যেন বাহিরে গিয়াছিলাম। ঐ ভদ্রলোক আমার বাসায় গিয়া আমাকে পাইলেন না। তিনি বাড়ীওয়ালী বৃদ্ধা ইহুদী মহিলাকে আমার কথা বলিলেন, (তখন রাত্রিকাল) কিন্তু তাঁহাকে বাড়ীতে রাত্রি প্রবাস করিতে দেওয়া দূরের কথা বাড়ীতে প্রবেশ পর্যন্ত করিতে দেওয়া হইল না। মালিক গোলাম ফরিদ সাহেব এম, এ, আট মাসের গর্ভবতী স্ত্রীও দুই আড়াই বছরের শিশু পুত্র সহ বার্লিনে আসিলেন। কাদিয়ান হইতে আমার স্থলে কাজ করার জন্য তাঁহারা যেদিন পৌঁছিলেন সেদিন তাঁর স্ত্রী এই হাজার পাঁচেক মাইল জাহাজ ও রেলে ভ্রমণের পর একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত আধ মরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা আমি তাঁহাদিগকে আমার নিকটে রাখি, কামরাও খালি ছিল, কিন্তু যেহেতু শিশু সঙ্গে আছে এই জন্য বাড়ীওয়ালী যায়গা দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। বলিলেন, 'শিশু ঘর খারাপ করিবে, জিনিস নষ্ট করিবে।' তখন শীতকাল, প্রচণ্ড শীত, বরফ পড়িতেছে, সন্ধ্যা সমাগত। আমি নিতান্ত বেহায়ার মত বলিলাম, 'আজ রাত্রিতে এরা আমার কামরাতেই থাকিবে, ওদের আমি কোথায় তাড়াইয়া দিব?" আমার শয়নকক্ষে সন্তান সহ বিবি সাহেবা থাকিলেন এবং আমার বৈঠকখানাতে আমরা দুইজন ইজিচেয়ারেই রাত কাটাইলাম। আমার শয়ন কক্ষের পার্শ্বেই ছিল ঐ বাড়ীর ঝির শোয়ার কামরা। সে সকালে তার বৃদ্ধা মনিবকে বলিল, "আমার মাথা ধরিয়াছে, কারণ গত রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। ছেলে মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিত আর ওরাও (আমি ও ফরিদ সাহেব) গভীর রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।" পরদিন নিকটস্থ এক পানসিয়নে (**Pension** ছোট এক রকম হোটেল) উহাদের থাকার বন্দোবস্ত করিলাম।

আবার দেখিয়াছি ঐ বাড়ীওয়ালীই আমার অসুখের সময়ে আমার যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন, আমার মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন, পথ্যাদি পাক করিয়া খাওয়াইতেন, আমার বিছানার পাশে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতেন, কত গল্প করিয়া আমার কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করিতেন, বলিতেন, "তোমার স্ত্রী, মা, বোন তোমার কাছে নাই, সে জন্য চিন্তা করিও না, আমরা আছি। তোমার যা দরকার সব ব্যবস্থা করিব।" আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতেন ও হাসি মুখে তার গত জীবনের কত কথা শুনাইতেন।

ঢাকা ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ বিস্থ একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাধারণ জ্ঞান ছিল অসাধারণ রকমের। উন্নত চরিত্র এবং তাঁর ছাত্রদের প্রতি, তথা ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। প্রথম সাক্ষাতে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "শিক্ষাদান আমি সবচেয়ে মহৎ কাজ বলিয়া মনে করি, এবং এইজন্য আমি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়াছি" এ কথা শুনিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "সত্যই শিক্ষা দান সবচেয়ে মহৎ কাজ (**Noblest of the professions**)" তখন এ দেশে মোটর গাড়ী আসে নাই, যাতায়াত ঘোড়া গাড়ীতেই হইত। মিঃ বিস্ পথে তাঁহার কোনও ছাত্রকে দেখিলে তাহাকে গাড়ীতে চড়াইয়া লইতেন। তিনি আমাদিগকে মনোবিজ্ঞান (**Psychology**) পড়াইতেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন "মনোবিজ্ঞান" তিনি পূর্বে পড়েন নি। প্রত্যহ নিজে রীতিমত পড়িয়া আসিয়া ক্লাশে লেকচার দিতেন। একদিন বলিলেন, "আজ আমি বাসায় পড়িবার সময় পাই নাই, সেই জন্য তৈরী হইয়া আসিতে পারি নাই। আজ লেকচার দিব না।" বি, টি, কোর্স শেষ হইলে একদিন তিনি

বলিলেন, "তোমাদের দেশে শিক্ষার খুব অভাব, আমি চাই তোমরা একদল ব্রতী মিশনারী হইয়া ফিরিয়া যাও। মাহিনার জন্য কাজ করিতেছ, এ কথা ভুলিয়া যাও। দেশের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদিগকে মানুষ করিতে হইবে, এই ভাব লইয়া কাজ কর।"

একদিন তাঁহাকে আমরা বলিলাম, 'স্যার ভারতের ইতিহাসের একটা পাঠ (**Lesson**) দেন।" তিনি বলিলেন, "ভারতের হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালের ইতিহাস আমার ভাল করিয়া জানা নাই।" তিনি বলিলেন, "ভারতের ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসে আমি এমন একটি চরিত্রও দেখি না, যার সম্বন্ধে আমি একটা **Lesson** বা পাঠ দিতে পারি।" আমার, বিদায় হওয়ার পূর্বে একদিন তিনি ক্লাশে বলিলেন. "নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে রাজনৈতিক আদর্শও শিক্ষা দিতে হইবে। বল দেখি তোমরা কি প্রকার রাজনৈতিক আদর্শ দেশের ছেলেদের সামনে ধরিবে?" কেহ কেহ বলিল, "স্বরাজ।" 'কি রকম স্বরাজ?" তখন একটু চাপাস্বরে কেহ বলিল, "ডমিনিয়ন ষ্টেটস" (**Dominion States**) অর্থাৎ – বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত স্বরাজ মিঃ বিস (**Biss**) বলিলেন, "স্বাধীনতা স্বাধীনতাই, হদবন্দি হইলে সেটা পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না (**Independence is independence, it should not be hedged in by condition timioration. Let full, Complete independence of india be yor political ideal**) ভারতের পূর্ণ সার্বভৌম স্বাধীনতা তোমাদের রাজনৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত। ইহা ঐ যুগের কথা যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও এইরূপ কথা বলিতে সাহস করিত না। ইহা ১৯১১ সনের কথা। ১৯২৪ সনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে মৌলানা হযরত মোহানীর প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই বলিয়া এক রিজলিউসন পাশ হয়। তখন মহাত্মা গান্ধীজীও এত বড় দাবী জানাইতে সাহস করিতেছিলেন না।

ট্রেনিং কলেজ হইতে বাহির হওয়ার কয়েক বৎসর পর হঠাৎ একদিন কলিকাতা জুলোজিক্যাল গার্ডেন বা প্রাণীশালায় মিঃ বিসের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অব এক্‌জামিনেশন্স। তিনি বলিলেন, "ছয় মাস পরে আজ একটু অবসর পেয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি।" পর পর কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই বাহির হওয়াতে বড় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। প্রবল পরাক্রান্ত আশুতোষ মুখার্জী ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ হইতে অপসারিত হওয়ার পর হইতেই এই বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছিল। কোন কোনও দল এইজন্য তাঁহাকেই দায়ী মনে করে। আল্লাহ্‌তালা ভাল জানেন। ইহারপর কণ্ট্রোলারের পদের সৃষ্টি হয়। মিঃ বিস্ বোধ হয় প্রথম কণ্ট্রোলার ছিলেন এবং প্রশ্নপত্র পূর্বে বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ভীষণ খাটুনি খাটিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি এম, এ, ডিগ্রিও দিয়াছিল। এরপর মিঃ বিস্ স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন এবং বাংলা দেশের শিক্ষা বিভাগের আভ্যান্তরিন অনেক দুর্নীতি (**Jobbery**) দেখিয়া তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মৌঃ আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী স্কুল সমূহের সেকেণ্ড ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। মিঃ বিস একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "**Moulavi Saheb, Bengal Educational Service is full of jobbery. It is not worth while to be in it.**" অর্থাৎ – মৌলবী সাহেব বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতিতে ভরা। ইহা চাকুরী করার উপযুক্ত স্থান নয়। ইহার কিছু দিন পর শুনিতে পাইলাম মিঃ বিস্ শিক্ষা বিভাগের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম প্রচারক হইয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দিকে গিয়াছেন।

ঢাকা ট্রেনিং কলেজে পড়া আমার বেশ লাগিত। শিক্ষা বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিষয়ের ইতিহাস, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদদের জীবনী অধ্যয়ন করাতে আমি বেশ আগ্রহ বোধ করিতাম। কিন্তু আমার শরীরটা বড় ভাল থাকিত না, সেইজন্য বেশী পরিশ্রম করিতে পারিতাম না। তসদ্দুক আহ্‌মদ (ইনি পরে খান বাহাদুর এবং শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন) আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং হোষ্টেলেও আমরা একসঙ্গে থাকিতাম। অনেক সময় ইনি পড়িতেন এবং আমি বসিয়া শুনিতাম, এবং পরে আমরা আলোচনা করিতাম। বি, টি, পরীক্ষার জন্য ভালভাবে তৈরি হইতে পারি নাই বলিয়া আমি মিঃ বিসকে বলিলাম 'স্যার, আমি পরীক্ষা দিব না।" "কেন?" "আমি ভালভাবে তৈরি হইতে পারি নাই, কারণ স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ যাইত।" তিনি বলিলেন, "না, তুমি পরীক্ষা দাও, আগেই নিরাশ হইতেছ কেন?" পরীক্ষা দিলাম, মন্দ দিলাম না, খোদার ফজলে পাশও করিলাম। বি, টি, পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার অল্পদিন পরেই আমি বদলি হইলাম এবং চট্টগ্রাম মাদ্রাসা-হাইস্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্-মাষ্টার পদে নিযুক্ত হইলাম।

চট্টগ্রাম মাদ্রাসা-স্কুল, তখন চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিনডেণ্টের অধীনে ছিল। এখন সেই স্কুলের নাম চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট মুসলিম হাই স্কুল এবং উহা বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টরের অধীনে। তখন শামসুল্ ওলামা মৌলবী কামালউদ্দিন আহ্‌মদ এম, এ, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে প্রথম হইতেই সুনজরে দেখিতে লাগিলেন। পরে সকলেই মনে করিত, আমি তাঁহার একজন প্রিয়পাত্র এবং আমার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। আমি আহ্‌মদী একথা তিনি প্রথমে জানিতে পারেন নাই। পরে মিঃ আবদুল্লাহ্ ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শুনিয়াছিলেন এবং আহ্‌মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন।

আমার বিবাহ

চট্টগ্রামে বদলির সম্ভবতঃ পূর্বেই আমার চাচার মেয়ে ওয়াজেদার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল। তখন ওয়াজেদার বয়স বছর এগারো মাত্র। ওয়াজেদার মা, (ডাক্তার হবিবর রহমান সাহেবের ভগ্নি) ওয়াজেদার বয়স যখন ৬।৭ বৎসর মাত্র তখন পিত্রালয়ে নকরিপাড়াতে প্রসবকালে মারা যান। এইজন্য ওয়াজেদা তার নানীর নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হয়। তার বড় মামা আবদুল আজিজ মিঞা নিঃসন্তান ছিলেন, এদিকে ওয়াজেদাও মাতৃহীনা, সেইজন্য বড় মামা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ওয়াজেদার রং কালো। তার সমবয়স্কা বৈমাত্র ভগ্নি রিজিয়ার রং ফরসা। চাচার ইচ্ছা এক মেয়ে আমাকে দেন, কিন্তু বয়সে ওয়াজেদা কিঞ্চিৎ বড় হইলেও তার সঙ্গে প্রস্তাব দিতে সাহস করেন নি, পাছে আমি রাজী না হই। কিন্তু বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি, ইত্যাদি ওয়াজেদার পাল্লা ভারী করে। আর একটি বিশেষ কথা। আমার ইচ্ছা বিবাহ দ্বারা চাচার ঋণ কিছু শোধ করা। আজকালকার দুনিয়া বলে, "আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারি।" ওয়াজেদার বিবাহের অসুবিধা হইতে পারে, চাচার হয়ত এজন্য বহু টাকা খরচ হইতে পারে, এবং তারপরও মেয়ের সেখানে আদর না হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়াছিলাম। ওয়াজেদা আমাদেরই বংশের মেয়ে, তার কষ্ট হইলে তার পিতার কষ্ট আমারও কষ্ট; কারণ, তাহাদের প্রতি আমার একটা আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল। একথাও মনে হইত, আমার নিজের রংও তো ফরসা নয়, এক সুন্দরী গৌরিকে আনিলে সে যদি আমাকে আন্তরিকভাবে ভাল না বাসে। যে চাচার দ্বারা আমি এতটা উপকৃত হইয়াছি তাঁহাকে মেয়ের বিবাহ লইয়া দুশ্চিন্তা ও অনর্থক বহু অর্থ ব্যয় হইতে বাঁচান আমার কর্তব্য। ইত্যাদী চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার ফরসা মেয়ের সঙ্গে বিবাহের

প্রস্তাবের (পত্রের) উত্তরে জানাইলাম যে, "ধলিকে নয়, আমি ওয়াজেদাকেই চাই।" ইহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি বিবাহকার্য্য শেষ করিলেন। আমার পিতা-মাতা কোনও আপত্তি করিলেন না। আমার এই মনোনয়নের জন্য পরবর্ত্তি জীবনে আমাকে কখনও আক্ষেপ করিতে হয় নাই। আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্‌।

ভ্রাতৃসঙ্ঘ

১৯১০ সনের পূজার বন্ধে (তখন আমি ঢাকা ট্রেনিং কলেজে) তদানিন্তন রাজসাহী কলেজের ইংরেজীর লেক্‌চারার মিঃ আতাউর রহমানের সঙ্গে ২য় বার কাদিয়ান শরিফে গিয়াছিলাম। সেবার হযরত খলিফাতুল মছিহ আউয়াল রাজিআল্লাহু-আনহু আমাদের কয়েকজনের জন্য নিজেই কোরাণ মজিদের দরস্‌ দিতেন এবং বারো জনকে লইয়া এক ভ্রাতৃসঙ্ঘ (**Brother hood**) তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃসঙ্ঘে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন :—

১। চৌধুরী ফতেহ্‌ মুহম্মদ স্যায়াল এম, এ,
২। মিঃ মুহম্মদ আতাউর রহমান এম, এ,
৩। মিঃ ফকিরুল্লাহ্‌ বি, এ,
৪। মৌঃ মুহম্মদ দীন বি,এ, অ্যাসিস্টেন্ট হেড্‌-মাষ্টার
৫। মোবারক আলী বি, এ,
৬। মিঞা আবদুল হাই (হযরত খলিফা সাহেবের প্রথম পুত্র)
৭। মৌলবী আব্দুল মুগ্নি খাঁ
৮। মৌলবী ফরজন্দ আলী
৯। আহ্‌মদ নূর, পাঠান আফগান
১৯। মৌলবী গোলাম রছুল, পাঠান আফগান
১১। সেখ্‌ তাইমুর এম. এ,
১২। মৌঃ আবদুর রহমান, শিক্ষক, টি, আই, হাইস্কুল 'কাদিয়ান'

ইহাদের পরিচয়—

১। মৌঃ ফতেহ্‌ মুহম্মদ স্যায়াল। ইনি দুইবার লণ্ডনে মুবল্লিগ ছিলেন। পরে কাদিয়ানে নাজেরে আলা (**Chief Secretary**) হইয়াছিলেন। লণ্ডনে ৬৩নং মেলরোজ রোডের প্রায় এক একর যায়গা সহ তেতালা বাড়ীটি লণ্ডন মিসনের জন্য তাহার চেষ্টাতে খরিদ করা হইয়াছিল। পরে এখানে মস্‌জিদ্‌ তৈয়ার হইয়াছে।

২। মুহম্মদ আতাউর রহমান ইংরেজীতে এম, এ, পাশ করিয়া রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করিতে ছিলেন; পরে আসামের **Assistant Inspector of School for Mohamadan Education** হইয়াছিলেন। পরে আরবী ও ফারসীতে এম, এ, পাশ করিয়াছিলেন, এবং **Assistant Director of Public Instruction, Assam,** হইয়াছিলেন। কিছুদিন বোধ হয় **D P.I** -এর পদেও কাজ করিয়াছিলেন। ইনি কোরআন মজিদ আসামী ভাষায় অনুদিত করিয়াছেন।

৩। মিঃ ফকিরুল্লাহ্‌। ইনি পরে বি, টি, পাশ করেন। শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করিতেন। ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টরের পদ হইতে পেনসন পান।

৪। মৌঃ মুহম্মদ দীন – ইনি পরে বহুকাল যাবত কাদিয়ান টি, আই, হাই স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার ছিলেন। অল্প কিছুকাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মুবল্লিগ ছিলেন। আজকাল (১৯৫৪-৫৫) রবওয়াতে নাজেরে দাওয়াত ও তবলিগ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

৫। আমি নিজে।

৬। মিঞা আবদুল হাই, ইনি হযরত খলিফাতুল মছিহ্‌ আউয়াল (রাঃ)-এর প্রথম পুত্র। তখন বয়স ১২।১৩ বৎসর মাত্র, হাইস্কুলে পড়িতেন। হযরত সাহেব তখন বলিয়াছিলেন, "মিঞা আবদুল হাই-এর কথা আমি খেয়াল করি নাই, কিন্তু এ যখন আসিয়া তোমাদের সঙ্গে বসিয়া গিয়াছে, আমি ইহাকেও

শামিল করিতেছি।" আবদুল হাই প্রায় ১৮ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিলেন।

৭। মৌলবী আবদুল মুগ্নি খাঁ। ইনি তখন আগরা কলেজে বি, এস, সি, পড়িতেন। ইহার পর তিনি কলেজ ছাড়িয়া কাদিয়ান হাই স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল পর নাজেরে বয়তুল মাল পদ প্রাপ্ত হন, সেই পদে তিনি জীবনের বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেষটা কিছু কাল নাজেরে দাওয়াত ও তবলিগ-এর কাজ করেন। আজ কয়েক বৎসর হইল ছেলছেলার চাকুরী হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ইহার জন্মস্থান ভারতের উত্তর প্রদেশের ফরুক্কাবাদ জেলায়, বংশে পাঠান। সারাজীবনই জমাতের হইয়া ইস্‌লামের খেদমত করিয়াছেন। তিনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু।

৮। মৌলবী ফরজন্দ আলী। জন্মস্থান পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায়। ইনি সৈনিক বিভাগে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন এবং বহুকাল অফিসের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ছিলেন। তিনি ১৯১০ সালে বয়েত করেন। চাকুরীর শেষ কালে "খান সাহেব" উপাধি পান। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর কয়েক বৎসর লণ্ডন মিশনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কাজ করেন। দেশে ফিরিয়া ইনি বরাবরই নাজেরে বয়তুল মালের কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র ডাঃ বদরউদ্দিন এম, বি, অত্যন্ত মুখলেছ আহ্‌মদী এবং বরাবর ছেলছেলার জন্য যথেষ্ট খেদমত করিয়া আসিতেছেন।

৯। আহ্‌মদ নূর, পাঠান আফগান। ইনি ছাহেবজাদা মৌলানা আবদুল লতিফ শহিদ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। মৌঃ আবদুল লতিফ সাহেব কাবুলের আমীর আবদুর রহমানের রাজসভার মোল্লার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীরগণের তাজপুশি অর্থাৎ, সিংহাসনে আরোহনের সময়ে মাথায় মুকুট পরিধান করিয়া দেওয়ার কাজ ইনি করিতেন। আহ্‌মদী মত গ্রহণ করাতে তাঁহাকে আবদুর রহমান নামীয় এক শিষ্যসহ ছঙেছার করা হয় অর্থাৎ, কোমর পর্যন্ত মাটির ভিতর পুতিয়া ফেলিয়া চতুর্দিক হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শহিদ করা হয়। আহ্‌মদ নূর তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীসহ মৌঃ আবদুল লতিফের (রাজিঃ) লাশ লইয়া আফগানিস্থান হইতে হিজরত করিয়া কাদিয়ানে আগমন করেন এবং তথায় বসবাস আরম্ভ করেন।

১০। মৌলবী গোলাম রসুল, পাঠান আফগান সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। কোরআন ও হাদিছ জানিতেন। সম্ভবতঃ তিনি আহ্‌মদ নূরের সঙ্গীদের একজন। কাদিয়ানে দেখিয়াছি, সামান্য রকম ব্যবসায় করিয়া গরীবানা ভাবে সন্তোষের সহিত সপরিবারে জীবন যাপন করিতেন। ইনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু।

১১। শেখ তাইমুর, এম, এ,। হযরত খলিফাতুল মছিহ্‌ আউয়াল (রাঃ)-এর বন্ধুপুত্র। ছেলেবেলায় পিতা পরলোক গমন করায় হযরত খলিফা সাহেব তাঁহার প্রতিপালন করেন এবং তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দান করেন। আলিগড় কলেজের লেকচারার হওয়ার পর হইতে বিশেষ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর প্রভাবে তাঁহার মনোভাব অনেক পরিবর্তিত হয়। হযরত খলিফা সাহেবের মৃত্যুর (১৯১৪) পর তিনি আহ্‌মদী জমাতের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন। বহুকাল পর্যন্ত পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের প্রফেছার ছিলেন। শেষ জীবনে ভাইস্‌ প্রিন্সিপ্যাল হন এবং অবসর গ্রহনের পূর্বে বোধ হয় প্রিন্সিপ্যালও হইয়াছিলেন।

১২। মৌঃ আবদুর রহমান হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন, undergraduate হইলেও ইংরাজী ভাল জানিতেন। Review of Religions-এ প্রায়ই মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতেন। যুবা বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভ্রাতৃসংঘ কায়েম করার সময়ে হযরত উল্লিখিত সকলকে ফজরের নমাজ ও কোরআন মজিদের দরছের পর নিজ বৈঠকে ডাকাইয়া বসাইলেন।

তৎপর তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তার মর্ম আমি নোটবুকে ইংরেজীতে নোট করিয়াছিলাম। নিম্নে বাংলায় তাহা দেওয়া গেল।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই অক্টোবর, ১৯১০। আজিকার দিন বিশেষ দিন, এবং এই সময় একটি বিশেষ সময়। আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাহা আমার খেয়াল মত নয়, বরং বিশেষ প্রেরণা পাইয়াই আমি ইহা করিতেছি। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে জানি না। বটের ছোট্ট বীজ এবং প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের মধ্যে অনেক তফাৎ। আজ আমি যাহা করিতে যাইতেছি, জীবনে ইতিপূর্বে তাহা কখনও করি নাই। বর্ত্তমান দুনিয়াতে পরিবর্ত্তনের এক প্রবল বাতাস বহিতেছে। ইসলামের বিপদ চারিদিক হইতে ঘনিভূত হইয়া আসিতেছে। এখন ইসলামের মহাসত্য নানা প্রকারে প্রচার করা আমাদের এক মহান কর্ত্তব্য, তাহা লেখাদ্বারা হউক, বক্তৃতাদ্বারা হউক, বন্ধুভাবে কথোপকথন বা আলোচনা দ্বারা হউক, আল্লাহ্‌তালার নিকট প্রার্থনা দ্বারা হউক, এমন কি মনের ইচ্ছাদ্বারাই হউক। সর্ব-প্রকারে আল্লাহ্‌তালার উদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োগ করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করা। আমরা যেন মুসলিম জাতির ও অপর সর্ব-সাধারণের সেবা করি। শুধু তাই নয়—আমরা যেন সর্বজীবে দয়া করি। কারণ ইসলামের খোদা কেবল মুসলিমদের খোদা নন তিনি রব্বুল আলামীন অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা প্রভু। আমাদিগকে সর্ব-প্রকার অহং ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে হইবে। ধন, সম্মান, ক্ষমতা, খ্যাতির প্রতি লিপ্সা বা আকাঙ্খা ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে সেবার উদ্দেশ্যে সেবাকরা, কোনও প্রকার স্বার্থের উদ্দেশ্যে নয়। ইসলামের নীতি হইতেছে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় অবলম্বন করা ও আল্লাহ্‌তালার সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ফলাফল তাঁহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া। চেষ্টা, পরিশ্রম, এবং খোদার উপর নির্ভরতা, দুইই চাই ; শুধু পরিশ্রম বা শুধু তওয়াক্কল বা খোদার উপর নির্ভরতা, একটার দ্বারা হইবে না। বাধা-বিঘ্ন বিপদ-আপদ নানা দিক হইতে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আসিতে পারে ; কিন্তু তাহাতে দমিয়া গেলে চলিবে না। আমাদের নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা, আল্লাহ্‌তালা মঙ্গলময়, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ন্যায়, সত্য, এবং প্রেম অবশেষে জয়লাভ করিবেই, এইটাতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। বর্ত্তমানে যদি কোনও সুফল না দেখি তবুও দমিয়া যাওয়া বা নিরুৎসাহ হওয়া উচিত হইবে না। আন্তরিকতা এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত যাহা করা যায় তাহা ফলপ্রশূ না হইয়াই পারে না, যদিও সে ফল আশু দৃষ্টিগোচর না হয়, বা সে ফল যেভাবে আসিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সেভাবে না দেখা যায়। আমাদের নিঃস্বার্থ কর্মের সহিত আল্লাহ্‌তালার রহমতের উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের উপর এবং আমাদের বংশধরগণের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ এবং অজস্র করুণা বর্ষিত হইবে।

আমরা আমাদের বর্ত্তমান কাজ ছাড়িয়া সংসার ত্যাগ করি, হযরত সাহেব ইহা চান না। তিনি বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন কর্মস্থানে চলিয়া যাও, এবং অধ্যয়ন, ব্যবসায়, বা চাকুরী যে যাহা করিতেছ তাহাই করিতে থাকো। 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ," এই নীতির উপর তোমাদের সর্ব-কর্ম গড়িয়া উঠুক।" এবং তিনি আরো বলিলেন, যেন আমরা ইহাই মানব জাতির মধ্যে প্রচার করি। কলেমাকে বাড়াইলে আজান হয়, এবং আজানকে বাড়াইলে নমাজ হয়। কোরআন ধর্মের সকল সত্যের উৎস। আমরা যেন সমগ্র কোরআন মজিদকে বারো (১২) ভাগে ভাগ করি এবং

আমরা এক একজন ইহার এক এক অংশ মুখস্ত করি এবং বিশেষভাবে অধ্যয়ন করি, ফলে আমাদের প্রত্যেকের কোরআন পাঠের সমষ্টিতে যেন পূর্ণ কোরআন গ্রন্থ হয়। আমরা বারো ভাই যেন পরস্পরের সহিত বিশেষ পরিচিত হই, এবং দূর দেশে থাকিলেও আমাদের মধ্যে পরস্পরের যেন পত্রালাপ বা অন্য প্রকারে খবরাখবর চলে। আমরা যেন বিশেষ মনোনীত এক দল বন্ধু হই—আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে ইসলামের সেবা করা ও ইসলাম প্রচার করা। এইসব উপদেশ দিয়া হযরত সাহেব আমাদিগকে সেদিনকার মত বিদায় দিলেন।

আমার নাম লিষ্টিতে পঞ্চম ছিল। সেজন্য আমার ভাগে পড়িল কোরআন মজিদের প্রথমদিক হইতে পাঁচ ছেপারা বাদে ৬ষ্ঠ ছেপারা হইতে আরম্ভ করিয়া আড়াই ছেপারা অর্থাৎ "লাইয়োক্বো পারা (সুরা নেছার শেষ অংশ) হইতে ছুরা আন-আমের শেষ পর্য্যন্ত। আমি ইহার অধিকাংশ হেফ্জ্ (মুখস্থ) করিয়াছিলাম এবং এই আড়াই পারা বিশেষভাবে অধ্যয়ণ করিয়াছি।

হযরত খলিফাতুল্ মছিহ্ আউয়াল (রাঃ) সাহেবের উপদেশাবলী

১৪-১০-১৯১০ইং তারিখে মৌলবী ফরজন্দ আলী সাহেব নব ভ্রাতৃসংঘ, আরও কতিপয় ভদ্রলোক এবং হযরত সাহেবকে সন্ধ্যার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াত্ দিলেন। খাওয়া হইল মছজিদে মোবারকের (ছোট মস্জিদ) সম্মুখে নবাব সাহেবের দালানে। আহারের পর হযরত সাহেব (রাঃ) বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। আমার বোধ হইল তাঁহার সে বক্তৃতা যেন কোন নবী বা অলি আল্লাহ্র যোগ্য। বক্তৃতার সার মর্ম ঃ—

১। তিনি কিরূপ জীবন যাপন করেন সে সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আমার পারিবারিক খরচ মাসে ২০৲ টাকা (কুড়ি টাকা)-তেই চলিয়া যায়।" তিনি ইহাও বলিলেন যে, মৌঃ মুহম্মদ আলী সাহেবকে একথা বলিলে তিনি একটু মুচকি হাসেন। আমি (মোবারক) দেখিয়াছি তিনি (হযরত) সংসারী হইয়াও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করিতেন। নিজের ও পরিবারের জন্য তাঁহার আয় হইতে সামান্য ব্যয় করিয়া বক্রি সমস্ত টাকা খোদার ওয়াস্তে এবং খোদার বান্দাদের ওয়াস্তে ব্যয় করিতেন। কিছুই জমা রাখিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমি আল্লাহ্র ব্যাঙ্কে জমা রাখি। দুনিয়ার ব্যাঙ্ক ফেল পড়িতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র ব্যাঙ্ক কখনও ফেল পড়ে না।" তিনি চাহিতেন যে, মুসলিমগণও এইরূপ জীবন-যাপন করুক। তবেই দুনিয়া স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে।

২। তিনি মর্মস্পর্শি ভাষায় সকলকে জীবনের ব্রতস্বরূপ তাকওয়া বা **Righteousness** (আল্লাহ্-তালার জন্য সর্বাপেক্ষা ভয়, ভক্তি ও প্রেম) অবলম্বন করিতে বলিলেন।

৩। নবী এবং বাদশাগণ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোক। তন্মধ্যে নবীগণ সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত, সফল কাম এবং সুখী। বাদশাগণের মধ্যে যার তাকওয়া বেশী, যিনি ন্যায় পথে ধর্মের পথে চলেন তিনি ততটা গৌরব, সফলতা এবং সুখ লাভ করিতে পারেন।

৪। সকল প্রকার ব্যবসায় সম্মানজনক। উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসা তেজারত (বাণিজ্য) যেমন হালাল, তেমনই অশিক্ষিত লোকের সর্বপ্রকার পরিশ্রমের আয়ও হালাল, কিন্তু জঘন্য ব্যবসায় মেথরের কাজ, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি, ডাকাতী ইত্যাদি। উহা পরিত্যাজ্য।

৫। কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলে সাদাসিদে পাকের পুষ্টিকারক খাদ্য ব্যবহার করিবে। খাওয়া

দাওয়ায় বিলাসিতা পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে একই ব্যয়ে অনেক বেশী লোককে খাওয়াইতে পারিবে। ইহা স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। ইহাতে সমাজে ভ্রাতৃ-ভাব বৃদ্ধি হয়। হালাল খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নহে।

৬। পুরুষরা মেয়ে লোকের কাপড় ছাড়া সব রকম কাপড় পরিতে পারে। প্রত্যেকের চার রকম কাপড় থাকা উচিত; শীতের, গ্রীষ্মের, বর্ষার, এবং যুদ্ধের জন্য।

আটপৌরে কাপড় ছাড়াও জুমা, ইদ, এবং সভা-সমিতিতে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত পোষাক থাকা উচিত। এমন পোষাক পরিবে যেন নিজের মর্যদাও বজায় থাকে অথচ তাহাতে বিলাসিতা বা বাবুগিরি প্রকাশ না পায়।

৭। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। আয় অপেক্ষা কখনও অধিক ব্যয় করিবে না।

নিজের জীবন এবং সর্বস্ব আল্লাতালার ওয়াস্তে উৎসর্গ করিবে। এই যমানার কদর কর। ১০০০ বৎসরের মধ্যে এমন দিন আর পাইবে না। তোমরা যদি ইসলামের খেদমত না কর, তবে তোমাদের সেটা দুর্ভাগ্য। আল্লাহ্‌তালা অন্য এক জাতিকে এই কাজের জন্য খাড়া করিবেন, তিনি ইসলামের রক্ষক, তাঁর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

আমি ও আতাউর রহমান সাহেব যখন কাদিয়ান হইতে বাংলা দেশে ফিরিতেছিলাম তখন হযরত খলিফাতুল্ মছিহ্ আউয়াল রাজি আল্লাহু আনহু আমাদিগকে বলিলে, "তোমরা লক্ষ্ণৌর পথে যাও এবং মৌলানা শিবলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলি তাঁহাকে দাও এবং জবাব লইও। জবাবগুলি পরে আমাকে জানাইও। প্রথমে তাঁহাকে বলিবে "আমরা বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছি। জবাব-গুলি লইয়া বলিবে, "আমরা কাদিয়ানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে ফিরিতেছি।" আতাউর রহমান সাহেব উর্দু ভাল জানেন বলিয়া প্রশ্নগুলি তাঁহার হাতে দিয়াছিলেন। আমিও একটা নকল লইয়াছিলাম; কিন্তু উত্তরগুলি মৌঃ শিবলীর মুখে শুনিয়া আমি ইংরেজীতে লিখিয়াছিলাম। উর্দু তখন ভাল জানিতাম না। উত্তরগুলি ঠিক লেখা হইয়াছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। গত বৎসর (১৯৫৪) আতাউর রহমান সাবেবের কাছে প্রশ্ন ও উত্তরগুলির এক কপি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়া কোনো উত্তর পাই নাই। কাজেই আমার কাছে যহা আছে তাহা হইতেই লিখিতেছি।

প্রশ্ন

১। দুনিয়ার পদার্থ (matter) অনাদি ও সৃষ্ট কি না, না স্রষ্টা?

مادہ عالم غیر مخلوق ہے یا مخلوق یا خالق -

২। ফেরেস্তা কিরূপ? সে সম্বন্ধে আম্বিয়া এক বর্ণনা দেন, আবার দার্শনিকগণ অন্যরূপ বলেন। এ সম্বন্ধে আপনার গবেষণার ফল কি?

ملائکہ کا بیان انبیا اور کرتے ہیں اور فلاسفر لوگ اور اپکی تحقیق کیا ہے *

৩। ঐশী বাণী কিরূপে আসে? আল্লাহ্‌তালা নিজে বলেন; না কোনো সৃষ্টশক্তি বলে, না মানুষ নিজেই বলে?

مکالمہ الہیہ کا کیا طرز ہے - یا اللہ تعالی خود بولتا ہے - یا کوئی مخلوق بولتی ہے - یا انسان خود بولتا ہے *

৪। অহি ও এলহাম যাহা প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা হয় উহা কি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে? কেন? যদি তার দরজা খোলা থাকে তবে আজ-কাল যাহারা অহি এলহাম পায় তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় কেন?

وحی و الہام جو بطرز حجت ہوتا ہے وہ اب بند ہے تو کیوں - اور اگر اسکا دروازہ کھلا ہے تو اسوقت ملہموں کو نفرت سے کیوں دیکھا جاتا ہے -

৫। নবীর সংজ্ঞা কোরান কি দিয়াছে? তদনুসারে খাতামান্নবীয়ীন শব্দের কি অর্থ হইবে? যদি نبیین অর্থে সব নবী হয় তবে ইয়াক্তুলুনান্নবিয়ীনার কি অর্থ হইবে? মসনবীর লেখক নিজের ধর্মগুরু (পীর) দিগকে অবাধে নবী, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা, নূহ, দাউদ, ইউসুফ কেন বলেন?

نبی کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے اور اُسکے مطابق خاتم النبیین کا کیا معنی ہے - اگر کل مطلقہ ہے تو پھر یقتلون النبیین کے معنی کیا ہوگا - اور صاحب مثنوی بے دھڑک اپنے شیوخ کو نبی - ابراھیم' موسیٰ' عیسیٰ' نوح' داؤد - یوسف کیوں کہتے ہیں *

৬। হাদিস সমূহ যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে কতটা, বা কি পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য? সেগুলির নির্ভুলতার মাপকাঠি কি? এই ১৩০০ বৎসরে কোন প্রামাণ্য বা বিশ্বাসযোগ্য হাদিস লেখা হইয়াছে কি?

৭। আপনার মতে কোন কোন ইতিহাস উৎকৃষ্ট?

৮। আপনার প্রশংসনীয় চেষ্টায় এমন একটি জমাত বা দল এ পর্য্যন্ত তৈয়ার হইয়াছে কি, যাহাদের মধ্যে এলেম ও আমল আছে এবং যাহারা দীনের মহব্বতে ভরপুর? অথবা হিন্দুস্থানে কিম্বা ইসলামী দেশ সমূহের মধ্যে এরূপ একটি জমাত তৈয়ার করার জন্য সফলতার পথ কেহ বাহির করিয়াছেন কি?

৯। ইসলামে বর্তমানে (وحدت ملیہ Unity of faith) সকলকে বিশ্বাসের একক্ষেত্রে আনয়ন করা যাইতে পারে কি? যদি ইহা সম্ভব হয় তবে আপনার মতে সে উপায়টি কি?

১০। ধর্মনেতা যদি নিজেই ধর্মাচরনে তৎপর না হন তবে তিনি কিরূপে ধর্মোৎসাহী এবং ধর্মকার্য্যে তৎপর লোক সৃষ্টি করিতে পারেন?

১১। আরবে সমবিশ্বাসীদের একতা (অল্প সময়ের জন্য হইলেও) কিরূপে সাধিত হইয়াছিল?

১২। মির্জা গোলাম আহ্‌মদ ও তাঁহার স্বনাভিষিক্ত (খলিফা) আপনার মতে কেমন লোক?

মৌঃ শিবলীর উত্তর—

১। (ক) আল্লাহ্‌তালার সৃষ্টি অনাদী নহে। এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস যুক্তিবিরুদ্ধ।

(খ) তাবেরী, ইবনে সিনা, আবু রোস্‌দ্‌ প্রমুখ দার্শনিকদের মতে পদার্থ সৃষ্ট; কিন্তু তবু অনন্তকালস্থায়ী। কার্য্যকারণ সম্পন্ন (**Follows the law of cause and effect**).

(গ) সুফি মতে অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নাই (**Pantheism**).

২। সুফি ও দার্শনিকদের মতে ফেরেস্তাগণ প্রকৃতির এক একটি শক্তি। সাধারণ বিশ্বাস অন্যরূপ। শিবলী প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন। দার্শনিকগণের আবির্ভাব হয় বিদ্বান লোকদের জন্য। নবীগণ সাধারণ লোকদের জন্য আসেন এবং নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে পরিচালিত করেন।

৩। সকল চিন্তা খোদাতালার নিকট হইতে সকল সকল মানুষের নিকট আসে। আচরণ সম্বন্ধে চিন্তাগুলি বিশেষভাবে নবীদের নিকট আসে, অন্য লোকের নিকট নয়। অন্যেরা খোদার নিকট হইতে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি লাভ করে। নবী তাঁহার নিজ নবুয়তের মাধ্যমে **Revelation** বা আকাশবাণী লাভ করেন।

৪। অহি, এলহাম নবী ও রছুলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের রসুলের মৃত্যুর পর উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নবী ও রসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

৫। আমাদের নবী মুহম্মদের (সাঃ) পরে আর কোন নবী আসিবে না। খাতামান্নবীয়ীন শব্দে নবীগণ অর্থ সকল নবী বুঝায়। কিন্তু يقتلون النبيين শব্দে কতিপয় নবী বুঝায়। মৌলানা রুমী তার মুরশেদ বা পীরকে যে নবী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন সেটি অত্যাধিক

ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ। মৌলানা রুমী নিজকে দিওয়ানা বা পাগলও বলিয়াছেন।

৬। হাদিস ওসুল দ্বারা জাঁচ বা পরীক্ষা করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা হয়। হাদিসের কেতাবগুলির মধ্যে বোখারীই সর্বোৎকৃষ্ট। হাদিস ইতিহাস হিসাবেও খুব ভাল। ইউরোপেও এমন ইতিহাস লেখা হয় নাই। আকিদার জন্য কোরআনই যথেষ্ট। আমল (আচরণ)-এর জন্য পথ-প্রদর্শকরূপে হাদিসের ব্যবহার হয় হাদিস হইতে রছুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনী পাওয়া যায়।

৭। ইতিহাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোখারী, তারপর তাবেরী বিশ্বাসযোগ্য। তারপর স্থান পাইতে পারে এব্‌নে খাল্‌দুন। যরকানীও বেশ ভাল। ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় হযরত রছুলে করীম (সাঃ)-এর ভাল জীবনী আছে। শিবলী সাহেব রছুলুল্লার (সাঃ) জীবনী নিম্নলিখিত কারণে লিখেন না।

(ক) তিনি ইউরোপীয় কোন ভাষা জানেন না। সেইজন্য ইউরোপীয় গ্রন্থকারদের দোষত্রুটী ধরিতে পারেন না।

(খ) তিনি উর্দ্দুতে লিখিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে ইউরোপের কোন উপকার হইবে না।

৮। না। নূতন আলোক, এবং কোরাণ ও হাদিসের গভীর জ্ঞান দ্বারা ইহা সম্ভব। নদ্‌ওয়ার উদ্দেশ্য ইহাই, বছর আটেকের মধ্যে এইরূপ লোক তৈয়ার করিতে পারিবে। ইমাম গয্‌যালী যেমন দর্শন ও আত্মিক জ্ঞানের মিলন সাধন করিয়াছিলেন; এখন আবার এক গয্‌যালীর আবশ্যকতা আছে। বর্ত্তমান যুগে অন্য কোথাও এমন জমাত তৈয়ার হয় নাই।

৯। না এখনও হয় নাই। নদ্‌ওয়ার লক্ষ্য ইহা। মুসলিমদের আপন আপন দেশে জাতীয় একতা হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের একতা হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আয়েশার মেরাজের ব্যাখ্যা।

১০। না, পারেন না।

১১। তাঁহারা ভাল মুসলমান, ইহার বেশী কিছু নহেন।

(ক্রমশঃ)

---

* মীর্যা আলী আখন্দ সাহেবের লিখিত, "পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস" ইনশাল্লাহ্ হযরত মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের "আমার জীবন স্মৃতি" প্রকাশিত হইবার পরে ছাপান হইবে। —সম্পাদক আহ্‌মদী

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by:

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,
West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:
Pakistan Rs. 5·00
Other Countries—Sh. 10/-
—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published fortnightly in

KENYA

on

CULTURAL SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA and E. AFRICA.

Annual Subscription Sh. 10/-

Write to

P. O. Box 554

NAIROBI, KENYA

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—	হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,,	মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,,	মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,,	মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,,	,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,,	,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,,	,,
১১।	ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম	,,	,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বর ?	,,	,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ)	,,	,,
১৪।	হোশান্না ,,	,,	,,
১৫।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	,,	,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.